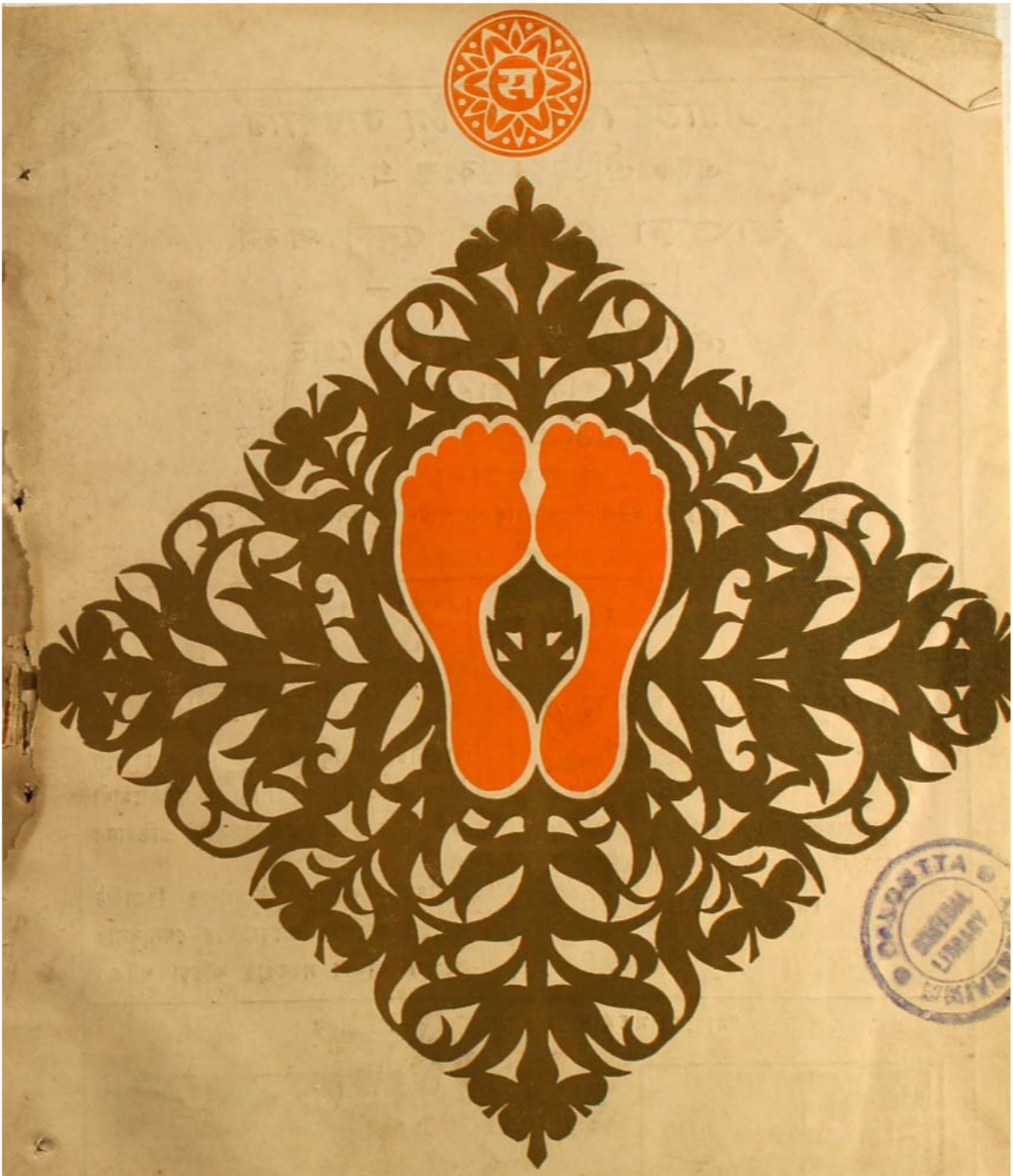

ভবসুখে

আষাঢ় • তেরশ' বিরানব্বই • উনচত্বারিংশ বর্ষ

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী
– লিমিটেড –

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা - ২৬
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা - ১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী ❖ কটক ❖ ধানবাদ ❖ পাটনা ❖ শিলিগুড়ি ❖ গৌহাটী

DRINK
ORPHAN'S TEA
For
HEALTH & ECONOMY
ORPHAN TEA SYNDICATE
133, Cornwallis St., Shyambazar
Phone : 55-2704

ফোন : ৩৪-৭২৫৮
এন্, কে, স্পোর্টস্
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।
❖
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers
PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST., CAL-6
PHONE : 34 - 5711

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৪১১
২২-১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

আষাঢ়

তৃতীয় সংখ্যা

সুধা সুরধুনী

উনচত্বারিংশ বর্ষ

তেরশ' বিরানব্বই

হঠাৎ ঝরা কৃপার ধারা	৫৯	শ্রীশ্রীঠাকুর
শিক্ষা-প্রসঙ্গে	৬০	শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেব
রঙ্গীন পাখী	৬৬	স্বামী সাধনানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	৬৬	শ্রীঅর্চনাপুরী
রসো বৈ সঃ	৬৯	শ্রীসাধনাপুরী
বচনামৃত	৭২	শ্রীশ্রীঠাকুর
শ্রীচৈতন্যের আলোকে		
বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ-সত্যানন্দ	৭২	স্বামী মহানন্দ
প্রেমের ঠাকুর	৭৬	শ্রীলোকশেখর চক্রবর্তী
হে আষাঢ় তোমায়	৮১	শ্রীশরণাপুরী
যুগস্রষ্টা বিবেকানন্দ	৮২	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উড্রফের দীক্ষা	৮৩	শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌ

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের নবপ্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

১। সাধুর চলার পথে – সাধকের জীবনের পথ নির্দেশ মূল্য—৬·০০

২। উপনিষদ চয়ন— উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের অনুপম ব্যাখ্যা মূল্য—৪·০০

৩। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব সম্পর্কে নবীন দৃষ্টিতে আলোচনা মূল্য—৩·০০

৪। আশীর্ব্বাণী— শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আশীর্ব্বচনের সংকলন মূল্য—৪·০০

৫। পরমার্থ প্রশ্নোত্তরে— কঠিন সাধন সায়রে নিমগ্ন থেকে পরশ রতনের সন্ধান লাভ করে তাপিত তৃষিত হৃদয়ের ব্যথা জুড়াবার মন্ত্র রেখে গেছেন মর্ত্যে আচার্য্যদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেব এই পরমার্থ প্রশ্নোত্তরে। এই অমূল্য গ্রন্থ-রাজের পূজা হোক ঘরে ঘরে এই আমাদের কামা— মূল্য—৪·০০

প্রাপ্তিস্থান : **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ২, প্রাণ কৃষ্ণ সাহা লেন**

কলিকাতা-৭০০০০৬, ফোন : ৫২-৭১৩৩

With Best Compliments From :

★ ★
★
★ ★

M/S. DECON & ENGINEERS

2/10/1, P. K. Roychowdhury 1st Bye Lane,
Howrah-711103

Civil & Mechanical Contractors Speciclist in mainteance,
Pipe Line & Painting Jobs.

On appoved list of Contractors of :—

M/s. G. K. W. Ltd.
HOWRAH-3.

M/s. Steel Authority Of India Ltd.
PAHARPUR STOCK YEARD.

M/s. Bharat Brakes & Valves Ltd.
(K. T P. P. Site Mecheda)
GOBRA ROAD, CALCUTTC-14.

Please Contact For Contract.

শ্রীকপিলেশ্বর মাহাত্ম্য	৮৫	শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
গান	৮৭	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
The Truth of Yajna (13)	10	Sri Sri Baba Thakur

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

'ভাবমুখে' মাসিক পত্রিকা—সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র।

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাসে। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে।

বাংলা ১৩৯২ সাল হইতে বার্ষিক মূল্য সডাক টাঃ ১৬'০০। ষাণ্মাসিক টাঃ ৮'০০।

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ : গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যক।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মণিঅর্ডার ফর্মের সর্বনিম্ন কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "স্বামী পরমানন্দ, পত্রিকা সচিব, ভাবমুখে, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬" (ফোন : ৫২-৭১৩৩) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের কয়েকটী পুস্তক

যুগেযুগে যার আশা—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব্ব জীবনালেখ্য) টাঃ ১২·০০

যুগাচার্য—(শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জীবনবেদ অবলম্বনে জীবনীগ্রন্থ) টাঃ ৬·০০

কথামৃতকথা—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিক যুগসম্মত ব্যাখ্যা) টাঃ ৮·০০

বেদচ্ছন্দা—(শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতবাণী সঙ্কলন—৫ খণ্ড একত্রে) টাঃ ৭·০০

জপধ্যান—(জপ ও ধ্যানমার্গে অধ্যাত্মসাধনার সহজ নির্দ্দেশ) টাঃ ৬·০০

জীবন গড়ো—(শিশু সাহিত্য) টাঃ ৫·০০

অভেদবাণী—(স্বামী অভেদানন্দজীর বাণী) টাঃ ১·০০

সমগ্র রচনাবলী—(৮ খণ্ডে) টাঃ ১৬০·০০

English publications of Swami Satyananda Dev

1. **World Philosophy** : Epistemology, Cosmology & Theology all in one volume. Rs. 60·00
2. **World Psychology** : Covers all the fields of psychology the world has ever cultivated, exhaustively informative and scientific in attitude. Rs. 30·00
3. **World Ethics** : The work contains evidences of a very wide reading and mirrors the moral fervour of the author's mind. Rs. 16·00
4. **Divine Flashes** : It contains all the practical aspects of religion. Rs. 5·00
5. **Song of the Soul** : It is a composition of songs on Sree Sree Thakur, Sree Sree Ma, Swami Vivekananda, Swami Abhedananda & other musical compositions. Rs. 5·00
6. **Abhedananda—The Messiah of Vedanta** : It is a biography of Swami Abhedananda, the Philosopher and Seer. Rs. 7·00
7. **The Philosophy of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda** : It is a concise account of the philosophy of the great seers. Rs. 4·00
8. **Divine Rhyme** : It throws a rare light on spiritual sadhana.
9. **Abhedananda Speaks** : It is the sayings of the great Swami (Collection) Rs. 0·50p.

Sree Sree Ramkrishna Ashram
(Publication Department)
2, Prankrishna Saha Lane, Baranagar, Calcutta-700 036.
Phone : 52-7133

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী শ্রাবণ, ১৩৯২

১লা	শ্রাবণ	১৭ই	জুলাই	বুধবার	— অমাবস্যা ও রাত্রে হোম।
১৯ই	,,	২৮শে	,,	রবিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
১৫ই	,,	৩১শে	,,	বুধবার	— পূর্ণিমার উপবাস ও রাত্রে হোম।
২৭শে	,,	১২ই	আগষ্ট	সোমবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩০শে	,,	১৫ই	,,	বৃহস্পতিবার	— অমাবস্যা ও রাত্রে হোম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

২৫শে আষাঢ় ১০ই জুলাই বুধবার — **কৃষ্ণাষ্টমী**। আমাদের সদ্গুরুপিতা **শ্রীশ্রীঠাকুর** সত্যানন্দদেবের তিরোধান তিথি। এদিন আশ্রম অন্তেবাসিগণ উদয়াস্ত উপবাস ও মৌনব্রত অবলম্বন করে হোম, জপ ও স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত থাকবেন।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কোবরা এভেন্যু রোড, কলিকাতা-৬

স্থাপিত ইং ১৮৮৬ সালে

৯৯ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইস্কল ও ওয়াশ্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, (Belgharia)

CALCUTTA-700056. *Phone* : 58-1575

মডার্ণ ডেকরেটর্স

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের

প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৪৫-২৫৪৯, ৪৫-৬৫৬৫

Gram : DISWASHING

PHONE : *Office* : 24-1236, *Works* : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants, Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4, HARTFORD LANE, CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road, Calcutta-700005.

Phone : 57-4562

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Electrical Engineers & Govt. Licensed contractors

145, LAKE TOWN, Block—'A'
CALCUTTA-700089

With Best Compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street
Calcutta-700005

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

Manufacturers of :

Direct Arc Electric Melting Furnaces for Melting
all Grade Steels,
Alloy Steels & Alloy Iron etc.

MINI MODEL	MAXI MODEL
SR-1—150 Kgs. Batch	SR-4—1000 Kgs. Batch
SR-2—250 Kgs. ,,	SR-5—3000 Kgs. ,,
SR-3—500 Kgs. ,,	SR-6—5000 Kgs. ,,

also supply
Special Steel and Iron Castings being manufactured
under technical guidance

and undertake
Projects and Turn-key jobs
Quality : : Guaranted

Registered Office :

3-D, NANDY STREET,
CALCUTTA-700 029.
Phone • 42-5197 I Gram I ENGEECEE

ভাবমুখে

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

উনচত্বারিংশ বর্ষ	তেরশ' বিরানব্বই	আষাঢ়	তৃতীয় সংখ্যা

হঠাৎ ঝরা কৃপার ধারা

শ্রীশ্রীঠাকুর

তুই যেন মা আষাঢ় ছাওয়া বাদল অন্ধকার
চকিত আলো বিজুলীতে তাকাই বারে বার ॥
রামধনুকের রঙের লাগি তবু কেন হই বিরাগী
আঁধার গলা রূপ সায়রে ডুবতে নারি আর ॥
হঠাৎ ঝরা কৃপার ধারা দিয়েই না হয় কর মা সারা
ভয়ে ভয়েই ধ'রবো না হয় মায়েরে আমার ॥

—:০:—

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

স্বামী সত্যানন্দ

সমস্ত জাতির উন্নতি, ব্যক্তির উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। শিক্ষা আমাদের দেশে দুটি ছিল—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার ত' এখন কোন চেষ্টাই বিশেষ নাই। পরাবিদ্যা হচ্ছে—ভগবৎ বিষয়ের বিদ্যা। কিন্তু অপরাবিদ্যা হচ্ছে—বর্ত্তমান শিক্ষা, যাকে বলে অর্থকরী বিদ্যা, তার সঙ্গে কিছু চরিত্র-গঠনশিক্ষা আর কিছু ধর্ম্ম জড়িয়ে থাকতেও পারে। শিক্ষার মূলকথা পাশ্চাত্য দার্শনিক 'ডিউই'-এর মতে will to learn,—'শিখব' মনের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর ক'রছে। আমাদের প্রত্যেক-দিন এই প্রতিজ্ঞা ক'রতে হবে—"আমরা জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে বড় হ'ব। তবে যে-মন এই প্রতিজ্ঞা ক'রবে সেই মনকে একাগ্র হ'তে হবে; মনের জোর আমাদের রাখতে হবে। মনের জোর রাখতে হ'লে শরীরকেও সুস্থ রাখতে হবে। শরীরের সঙ্গে মনের যোগ খুব বেশী তাই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। মনের জোর নির্ভর ক'রছে মনের যিনি অধিপতি, মনের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রধানতঃ তাঁর ওপর। তাই মনের জোর বাড়াতে হলে ভগবৎ ভক্তি প্রার্থনা রাখতে হবে। তার পরে চাই মন যেন নানাদিকে ছড়িয়ে না পড়ে। যেসব ছাত্রেরা মনের বাজে খরচ করে না. তাদের মনের একাগ্রতা বজায় থাকে। মনের বাজে খরচ বলতে গেলে আমাদের যে রাখতে হবে বৃথা চেষ্টা, বৃথা বিলাস, খাওয়া, পরা সব দিকেই যেটুকু প্রয়োজন আমরা যেন তার বেশী না করি। যে সব বইতে আমাদের মনকে চঞ্চল ক'রে তোলে; যে সব জিনিষ খেলে বা দেখলে মন চঞ্চল হয় সে সমস্ত থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে রাখতে হবে। তা না হ'লে শিক্ষণীয় বিষয়ে আমরা মনোযোগ দিতে পারব না। যেসব পরিবেশে, যেসব সঙ্গে এলে আমাদের মনের চঞ্চলতা আসে; শক্তির ক্ষয় হয়; সে সব পরিবেশ সে সব সঙ্গ আমাদের ত্যাগ ক'রতে হবে। এক কথায় সৎ হ'তে হবে কায়ে-মনে-বাক্যে॥

: শিক্ষার লক্ষ্য—এগিয়ে পড়া :

স্বামিজী বলেছেন,—শিক্ষা বলতে আমাদের মধ্যে যে সত্য আছে তার প্রকাশ। It is the innate nature of the human soul ;· ···the infinite power within, latent or veiled, becomes at last fully manifest. (Knowledge : Its source and development)

রুশো বলেছেন : বাধা সরিয়ে দিয়ে শিশুকে তার মধ্যে যা' আছে তাকে প্রকাশ করতে দেওয়া (Free self-development)।

এই self-development-ই এখন নীতিশাস্ত্রমতে মানুষের চরম পাওয়া। আজ সমস্ত জগৎ এই চরম পাওয়ার পথ খুঁজে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে। Self বলতে আমাদের পশুপ্রকৃতি, না দেবপ্রকৃতি, না দেবপশু মিলিত প্রবৃত্তি, এটি ঠিক করে নিতে হবে।

Mcdougall চারিটি ধাপ স্বীকার করেছেন, মানুষের শীল বা আচরণ বিষয়ে; প্রথম স্তরে আমরা instinct—সহজাত প্রকৃতি দ্বারা চালিত হই। অবশ্য সুখ-দুঃখ দ্বারা এগুলির কিছু রূপান্তর ঘটে। দ্বিতীয় স্তরে আমরা সহজাত প্রকৃতি দ্বারাই চালিত হই—কিন্তু সামাজিক পুরস্কার বা শাস্তি এদের প্রভাবান্বিত করে; তৃতীয় স্তরে আমরা সমাজের প্রশংসা বা অপ্রশংসা দ্বারা প্রধানতঃ প্রভাবান্বিত হই। চতুর্থ বা শেষ স্তরে যাঁরা যেতে পারেন তাঁরা আদর্শ জীবনের উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ হ'য়ে কাজ করতে পারেন।

সকলের মতেই শিক্ষার্থীদের এক পন্থা—এগিয়ে পড়া।

বেদের মন্ত্র চরৈবেতি অর্থাৎ এগিয়ে পড়। শ্রীঠাকুরও বলেছেন—এগিয়ে পড়। এগিয়ে পড়াই আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদে এই লক্ষ্য শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবন-বেদ হোক্—এই আমাদের প্রার্থনা।

: শিশুশিক্ষায় দু'একটি কথা :

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শিশুদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "শিশু নারায়ণ"। আর বেথেলহেমের ঠাকুর যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কারণ স্বর্গ রাজ্য তাদের।" এই শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ধৈর্য নিয়ে নিজেদের তৈরী হয়ে দাঁড়াতে হবে, প্রথমেই মনে করতে হবে, ছেলেরা যে সংস্কার নিয়ে এসেছে সে সংস্কার পূর্বজন্মেরই হোক—কি পিতামাতা, পূর্বপুরুষ বা সমাজ জীবনেরই (Race instinct) হোক তা বদলান যায় না। তারপর শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে এই শিশুদের জগৎ ও আমাদের জগৎ আলাদা (koffka —The growth of the mind)। তারা যে চক্ষে জগৎ দেখে আমরা সে চক্ষে জগৎ দেখি না। তাই শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে আমাদের শিশুরাজ্যে প্রবেশ করতে হবে—তাদের চোখ দিয়ে জগৎটাকে শিখতে হবে, বুঝতে হবে।

ছেলেদের প্রথম শিক্ষা হয়, তাদের হাত, পা ছোড়ার মধ্য দিয়ে। কাজেই যখন মায়ের কোলে তারা হাত, পা ছুড়তে শেখে তখন আমাদের বৃথা বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয় বরং নানাভাবে তার সাহায্য করা উচিত। দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় যখন ছেলেরা খেলা করতে পারে। এই সময় ঠিকমত খেলার জিনিষ পাওয়া দরকার। এসব যদি তারা কিছু ভেঙেও ফেলে তবু তখন তাদের সাজা দেওয়া সব সময় উচিত নয়, কারণ এই ভাবেই তারা নূতন কিছু গড়নের অভিজ্ঞতা পায়।

এরপর আসে অভিনয়ের বয়স। এ সময় তারা Symbolic play-তে অভ্যস্ত হয়। এ সময় তারা বাবার মত মার মত বড় হতে চায়, আর সেইভাবে অভিনয়ও করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কাজেই যখন ছেলেরা বড়দের অনুকরণ করে তখন তাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তারপর আসে তাদের সামাজিক জীবনের আস্বাদ নিয়ে খেলা (Social play)। প্রথম মায়ের সঙ্গে, পরে ভাইবোন, শেষে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধুলোর মধ্য দিয়ে সে নিজেকে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত করে তোলে। ভালবাসা, ঝগড়া, প্রতিযোগিতা এ সবই তার জীবন গড়ে তোলে, পূর্ণতর ক'রে তোলে।

শিশু শিক্ষার সময় আমাদের আরও মনে রাখতে হবে ছেলেদের নানারকম থাক্ আছে। একদল দেখা যায়—তারা বহির্মুখী কর্মী (Extrovert), আর একরকম আছে অন্তর্মুখী ভাবুক (Introvert)। অবশ্য বেশীরভাগ ছেলেকেই দেখা যায় যে, এই দুই-এর সংমিশ্রণ (Ambivert), কখন কর্মী কখন ভাবুক। এইসব ছেলেদের পড়াতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা থাকা উচিত (Wood-Worth Psychology)।

শিশুদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক হচ্ছে তাদের মা ও বাবা। এঁদের জীবন-আদর্শ ছেলেদের ওপর অনেক কিছুর ছাপ এনে দেয়। তাই ভাল ছেলে দেরে গড়ে তুলতে হলে বাবা ও মাকে ভাল হতে হবে। শিক্ষকের বেলায়ও সেই কথা। অতি আদরে ছেলেরা দুর্বল, পর-বশ হয়ে সারা জীবন কষ্ট পায়। আবার অনাদরে ছেলেরা ভীত, অক্ষম, সাহসহীন, হতাশ-ভাবসম্পন্ন হয়ে পড়ে। রাশিয়ার Social welfare organisation-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বেকারদের মধ্যেও শতকরা পঞ্চাশ জনেরও অধিক পিতৃ-মাতৃহীন হয়েছিল ছেলেবেলায়।

শরীরের সঙ্গে মনের যোগ শৈশবে বেশী। তাই ছেলেদের অনেক উপদ্রব তাদের জন্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় ছেলেদের দোষ তাদের পারিপার্শ্বিকের জন্য হয়। যেমন ছেলেবেলায় অনেকে চুরি শেখে, সামান্য ছোট ছোট জিনিষ না পেয়ে—আচার কি দুটো পয়সা। ছেলেদের ভূতের ভয় পাইয়ে দেওয়া অনেক সময় বড়দের স্বভাব। অন্ধকারে ভূতের ভয়, আওয়াজ করে ভয় দেখান হয়। এর জন্য সারাজীবন হয়ত ছেলেরা ভীত হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় ছেলেদের superiority complex-ও আমরা তৈরী করে দিই—হয়ত কাউকে বোকা বলে বা তার শরীরের হীনতার কথা বারবার বলে। এমনিভাবে তাদের মনকে দুর্বল করে ফেলি এবং এটি বড় হয়ে স্থায়ি হয়ে যেতে পারে। অনেক সময়, আবার আমরা ছেলেদের কাছে তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু আশা করি। তার ফলে তাদের ওপর নির্যাতন চলে, সেটিও অনুচিত ছেলেরা যাতে শয্যা নষ্ট করে বা নখ কামড়ায়—এগুলি শুধু শাস্তি দিয়ে ঠিক করা

যায় না। আবার ছেলেদের উপদ্রব অনেক সময় তাদের শক্তিরই পরিচায়ক। যে সব ছেলে ভবিষ্যতে কোন্ বিষয়ে নেতৃত্ব করবে তাদের ছোট বয়সেই সেগুলির পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। এদের মোড় ফেরাতে পারাই প্রকৃত শিক্ষকের কাজ। অনেক সময় ছেলেদের অলসতার ভিতরে বড় হবার বীজ লুকিয়ে থাকে। Darwin এমনি একটি ছেলে ছিলেন।

ধর্ম ও নৈতিকতাই জগতের ভিত্তি। বৈদিকযুগে এই ধর্মকে আদর্শ করে আমাদের এই অমর ভারত গড়ে উঠেছে যার ফলে বহু মহামানবের সৃষ্টি হয়েছে ও আজও হচ্ছে। তাই ছেলেদের ধর্মের ওপর জীবন গড়ে তোলবার জন্য প্রথমতঃ সাধু মহাপুরুষদের জীবনী গ্রন্থ পড়ান দরকার।

শেষে আর একটু কথা, স্মৃতিশক্তির চর্চা ছেলেদের প্রথম থেকেই খুব প্রয়োজন। (All learning depend upon memory koffka—The growth of mind)। ছোট বেলা থেকে ভাল ভাল ছড়া, কবিতা শিশুদের মুখস্থ করান উচিত।

Child Psychology বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—ঐ কচি বয়সে ওদের সামনে Type-character তুলে ধরতে হবে। সহজ সরল ভাবে বিশ্বের স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষদের ছেলেবেলাকার কথা ওদের জানাতে হবে। কারণ ওরা জানবে শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, আর্টে, দর্শনে ও রূপে কত কত বীর ও মনস্বী এই পৃথিবীতে এসেছেন। কিভাবে তাঁদের দিন কেটেছে। এতে আর একটি লাভ হবে আমরা One world-এর দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

ছেলেদের মনে Type-Character দিতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার রাজ্যের আবোল তাবোলও থাকবে—আর থাকবে ওদের মনের arane-র কিছু ফাকা জায়গা। যা কল্পনায় রঙ্গে ও রাঙিয়ে নেবে।

আমার মনে হয় বাচ্চাদের এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে—তারা যেন শিক্ষা নেওয়াটাকে ভয়াবহ মনে না করে। আন্তরিকতার সঙ্গে ভালোবেসে ধীরে ধীরে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। তারপর শিক্ষণীয় বস্তুটাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে তারা প্রাণের টানেই শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তাছাড়া ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেরা যত অঙ্গ সঞ্চালন করবে, দৌড়াদৌড়ি করবে ওদের বুদ্ধি ততই খেলবে, brain cell-গুলো ততো সক্ষমতা লাভ করবে। তারপর শিশুদের শিক্ষা দিতে গেলে শিশুদের মনের কথা জানতে হবে—তারা কি ভালবাসে। সাধারণতঃ ছেলেরা খেলতেই ভালোবাসে। কাজেই বেশীক্ষণ তাদের পড়ানোর জন্যে একভাবে আটকে রাখা ঠিক নয়। আমি তো এখানে এদের বলে দিয়েছি খানিকক্ষণ করে পড়ানোর পর বাচ্চাদের একটু বাগানে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে দিবি, তারপর আবার পড়াবি। ওদেশে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য গভর্নমেণ্ট থেকে বইয়ের জন্য কত খরচ করে, কতরকম ছবি দেওয়া বাচ্চাদের বই ছাপায়। বাচ্চাদের মধ্যে love of nature-টা খুব বেশী দেখা যায়। কাজেই ওদের বইতেও তেমনি সব ভাল ভাল ছবি দিতে হবে। আর ওই পড়ার মাঝে মাঝে একবার করে প্রকৃতির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। আর ভাল ভাল কিছু খাবার জিনিষ যা বাচ্চা মাত্রেই ভালবাসে—তাও দিতে হবে।

তারপর সাধারণতঃ বাচ্চাদের কোঁক একটু সুরের ওপর। সুরের মাধ্যমে যদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি শেখে। এখানে আমি ব্যবস্থা করিয়েছি ছেলেরা হয়তো এক্সারসাইজ করতে চাইছে না—তো ওই সারগমের সঙ্গে করানোতে দেখা যাচ্ছে বেশ উৎসাহের সঙ্গে সব এক্সার-সাইজ করছে। মোট কথা, শিশুদের মনোভাব বুঝতে গিয়ে কিছুটা শিশুর মতই হতে হবে, তবেই ভাল শিক্ষা দেওয়া হবে।

: শিশু মনস্তত্ত্ব :

...To understand a Child one must go back to his own childhood. ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে sympathetic attitude নিয়ে; ছেলেদের Idea খুব graphic হয় না। Result নিয়েই তাদের বেশী কারবার। Child Psychology study করতে গেলে, তাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে হবে। What do they talk about? তারা কি বলে? কিন্তু মুসকিল এই যে, তাদের সামনে বড়রা কেউ গেলেই, তারা চুপ করে যায়।

তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে, যখন তারা নির্জনে একা ঘরের কোণে কোন জানালার ধারে বসে, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কথা বলে, পাখীর সঙ্গে, ফড়িং বা প্রজাপতির সঙ্গে, গাছ-পালার সঙ্গে, জীবজন্তুর সঙ্গে, তারা কত কথা বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, শিশুরও এইরকম মনোভাব ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, evolutionary Process-এ। আগের মত কথা শিশুরা বোধ হয় বলে না।

আশ্রমের খাঁচায় একটি পাখী ছিল—সে আপনিই এসে ঢুকেছিল। ছেড়ে দিলেও যেতে চাইত না। কেউ পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেই, নানারকম শব্দ করে, কাছে ডাকার চেষ্টা করত—attention draw করত, আর কতরকম ভঙ্গী করে নাচত। তারপর তার সঙ্গে কিছু কথা বলে আদর করলে তখন শান্ত হত। হয়ত কোন star-এ এজন্মে পাখী হয়েছে।

যুগ গেছে বদলে—ছেলে মেয়েদের শিশুভাব কমে যাচ্ছে—বড় সব পাকা পাকা কথা—পুতুল বা খেলনা নিয়ে বড় একটা খেলে না। কেবল সিনেমার গল্প, গান, ভালোর চেয়ে মন্দ শেখার, এখন চেষ্টা খুব বেড়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের সিনেমা দেখে—'মা আমার বিবেক দে, বৈরাগ্য দে'—কেউ শিখল না। শিখল কেবল—'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে মত, পানতোয়া মত মত'—গান।

বর্তমানে ছেলেমেয়েদের পড়ার কথা কিছু মনে থাকছে না, হয়তো পিতৃপিতামহগণের নামও জানে না। কিন্তু সিনেমা আর্টিস্টদের নাম বা কথা খুব জানে। বড় বড় ফুটবল প্লেয়ারদের কথাও জানে।

মূলকথা হচ্ছে—আমাদের জাতীয় কৃষ্টি—পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধা—এসব হারাতে হবে।

: ভক্তবাড়ীর বাচ্চা শিশুদের প্রতি :

বড় হয়ে কি করবি? কি হবি? Player হবি, না চাকুরী করবি, না ব্যবসাদার হবি?

উঃ—চাকরী করব।

দেখ যারাই চাকুরী করে তারা লেখাপড়া করে। লেখাপড়ায় ভাল না হলে তো চাকরী পাওয়া যায় না। কাজেই মন দিয়ে পড়াশুনা ভাল করে করবি। আমি দেখ এত বয়সেও সেই রাত্রি একটা পর্যন্ত পড়ি। আমার কতো বই তোরা তো দেখেছিস ভেতরে গিয়ে। কাজেই ভাল করে পড়াশুনা করবে, তবে তো কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার এসব হতে পারবে। কেউ বা নিজেদের মিলেই ভাল চাকরী নিলে। নিজেদের মিলে নিজেরাই চাকরী করলে মিলের কোনো ক্ষতি চট করে হয় না। যারা যত চিন্তাশীল, যারা যত intelligent হয়েছে তারাই ইতিহাসে বড় হয়েছে। বাঁদরগুলো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়, এ বাড়ীর ছাদ থেকে ও বাড়ীর ছাদে লাফায়, ডালে ল্যাজ পাকিয়ে ঝুলতে পারে, কিন্তু তাদের কেউ বড় খেলোয়াড় বলে না, ইতিহাসের পাতায় তাদের নামও কেউ লেখে না। কাজেই তোমরা পড়াশুনা মন দিয়ে করবে, চিন্তাশীল হবে আর তোমরা সব ঠাকুরকে সকাল-সন্ধ্যা ডাকবে। ঠাকুরের নামে সব বড় হতে হবে, ভাল ছেলে হতে হবে। বাড়ী গিয়ে রোজ মন দিয়ে পড়াশুনা করবে।

ছোট ছেলে-মেয়েরা তোমরা আজ ছোট আছ, কিন্তু তোমরা আসলে মোটেই ছোট নও, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তোমরা সকলে বড় হয়ে যেমন হবে, ভারতের ভবিষ্যৎও তেমন হবে। তোমরা ভালছেলে হলে ভারতের ভবিষ্যৎও ভাল হবে।

তোমরা চিরদিন হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে চলবে। কোনদিন কোন অন্যায় করবে না, কোন অসৎ কথা বলবে না। অন্যায় করলে, অসৎ কথা বললে দেখবে ভয়ে বুকটা ধুক্-ধুক্ করবে। তোমাদের নেতাজীর মত, গান্ধীজীর মত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত, স্বামিজীর মত হতে হবে আর নিজেদেরও উন্নতি করতে হবে। নেতাজী, স্বামিজী এদের মত তোমাদেরও জগতের বুকে, ইতিহাসের বুকে একটা দান রেখে যেতে হবে। আর যারা এ বছর prize পাওনি তারা দুঃখ করবে না। আবার নতুন চেষ্টা নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে উঠে পড়ে লাগ, যাতে ভবিষ্যতে তোমরাও পুরস্কার পেতে পার। তোমরা সকলে একসঙ্গে আমার শুনে শুনে জোরের সঙ্গে বলে যাও : 'আমরা জীবনে বড় হব'। সকলে আমরা জীবনে বড় হব।

: শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের প্রতি :

তোমরা সব ঠাকুরের নামের স্কুলে পড়ছ কাজেই ঠাকুরের ভক্ত হতে হবে। নিত্যদিন ঠাকুরকে ডাকবে, লেখাপড়ায় উন্নতির চেষ্টা করবে আর প্রার্থনা করবে। বড় হয়ে সব ভাল করে পাশ করবে বিলেত ইত্যাদি দেশে গিয়ে দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। ওখানে নতুন সব বিদ্যা শিখে এসে নিজের দেশের উন্নতি করতে হবে। আবার খেলাধুলোও করবে, গায়ের জোর কিন্তু দরকার। তারপর ভোরবেলা উঠে সব একটু চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করবে। তোমরা সব খুব মন দিয়ে পড়বে। আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে, ভাল result করবই জীবনে বড় হবই।

: শিক্ষকদের প্রতি :

তোমরা সব ছাত্রদের উন্নতির জন্য খুব সচেষ্ট হবে—বোঝাবে, বলে-দেবে, আদর করবে আবার শাসনও করবে। আমাদের সময় রসময় মিত্র মশায়, হিন্দু স্কুলের ব্রহ্ম কিশোরবাবু এঁরা কত ভাল শিক্ষক ছিলেন। যেমন ছেলেদের শিক্ষা দিতেন তেমনি তাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও লক্ষ্য রাখতেন। তাঁদের ভয়ে ছাত্ররা এটেন্ট হয়ে থাকত, result ও ভাল হত। তোমাদের সব man-making শিক্ষার সম্বন্ধে উৎসাহী হতে হবে, নজর রাখতে হবে। শিক্ষার সম্বন্ধে spartan-দের strict principle ও মন্দ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তারও প্রয়োজন আছে। দুষ্ট ছেলেদের ক্ষেত্রে কড়া শাসনও দরকার। সকলেরই কিছু ভাল ব্যবহার বা স্নেহ ইত্যাদি পেলে মানুষ হওয়ার ইচ্ছা জাগে না। spartan-রা তখনকার দিনে ছিল দুর্দ্ধর্ষ জাতি, একরকম অপরাজেয় জাতি, তো তাদের ছাত্রদের শিক্ষার সময়ে সবসময়ে মাস্টাররা বসে থাকত না। ছাত্ররা নিজেরাই পড়ত আর বলিষ্ঠ ক্রীতদাসরা হাতে বেত নিয়ে বসে থাকত, না পড়লেই খুব করে বেত মারত। অবশ্য আমি এটাকেই খুব প্রশংসনীয় বলছি না। তাহলেও জায়গা বিশেষে ভয় জাগানোর জন্য শাসন, প্রহার এসবও দরকার হয়। আমার মনে হয় কি জান, শিশুর মধ্যে, বালকের মধ্যে যেমন দেবত্ব আছে তেমনি পশুত্বও আছে আর তারা সেটাকে দমন করতে পারে না। হিংসা হলে কামড়ে দিলে, রাগ হলো মারতে লাগলো এই যে স্বভাব এগুলো animalitis-র প্রকাশ। বড় মানুষ ভেতরে ভেতরে ওই স্বভাব থাকলেও প্রকাশ করে কম কিন্তু শিশু বা বালক সেটা পারে না। আবার তারা অনেকটা বন্ধন মুক্ত। তাদের মধ্যে দেবত্ব আছে, বড় মানুষের চেয়ে বেশী! তাই আমার মনে হয়, শিশু বা বালকদের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তার জন্য তাকে ভালবাস, আদর কর কিন্তু তার মধ্যে যে পশুত্ব আছে সেই পশুত্বকে শাসন করতে, দমন করতে হবে। দরকার হলে সেই পশুত্বকে জয় করার জন্য দু'চার থাপ্পড় দিতে হবে। এজন্য বাচ্চাদের কিছু শাস্তি, কিছু শাসন দরকার।

শিক্ষকদের আর অন্য উপদেশ কি দেবো—তবে তাদের ওপরই সমাজ গঠনের অনেকটা দায়িত্ব রয়েছে। এখনকার শিক্ষক ছাত্র তৈরী করবে কি করে, নিজেরাই সবঠিক তৈরী নয়—ছাত্র তৈরী করতে গেলে সমাজের কল্যাণ কল্পে শিক্ষকের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে কঠোর সংযমের সঙ্গে, সংসার তারা করবে ঠিক—কিন্তু খুব নৈতিক জীবন যাপন করতে হবে, বিলাসিতা বর্জন করতে হবে—অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। বৃনোরামনাথ তো মস্তবড় জ্ঞানী আর আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি খুব গরীব ছিলেন। একবার এক ধনী তাঁকে কিছু করে প্রত্যেকমাসে এ্যালাউন্সের মত দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু রামনাথ বলেছিলেন অর্থ নিয়ে কি হবে? আমার গৃহিণী আছে, রান্না করে দেয়, ছাত্ররা ভিক্ষে করে চাল এনে দেয়, আর ওই সামনেই তেঁতুল গাছ, ওই পাতার ঝোল দিয়ে ভাত খাই, কাজেই আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। এখন এই বৃনোরামনাথ মস্তবড় পণ্ডিত ছিলেন, ছাত্রদের কত যত্ন করে পড়াতেন কিন্তু কেমন নির্লোভ অনাড়ম্বর জীবন তাঁর। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণ, ঋষি আচার্য এরাও তো ওই রকমই সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, কিন্তু জ্ঞানের সব জাহাজ ছিলেন। এখনকার শিক্ষকরা সেই আদর্শে নিজেরাই তৈরী হয়নি। নিজেদের পাশের জন্য যতটা দরকার, কিন্তু পরে অধ্যয়নের সঙ্গে বড়

একটা সম্বন্ধ থাকে না একরকম, তারপর শিক্ষক বৃত্তি ছাড়াও side business করতে লাগলে-তারা আর কি করে ছাত্রদের কল্যাণের কথা চিন্তা করবে– কতটুকু সময়ই বা পাবে তারা ? আর বর্তমান সমাজের অর্থচাপও আছে ঠিকই কিন্তু শিক্ষকদেরও জীবনধারা ঋষিদের মতো আর নেই। কাজেই আমার মনে হয় শিক্ষক সমাজ যদি একটু সব ধর্মমুখী হয়, নৈতিক বল না হারিয়ে ফেলে জীবনটাকে যদি সংযমের মধ্যে ভোগ করে, তবে ছাত্র সমাজের সংগঠনের দায়িত্ব তারা ঠিক ঠিক বহন করতে পারবে। কিন্তু তা কি হবে ?

: সাধুশিক্ষকদের প্রতি :

তোমরা পড়াবার সময় শিশুদের মধ্যে, ছেলেদের মধ্যে নারায়ণ জ্ঞানের চেষ্টাটা রাখবে। যদিও এ যুগে ছাত্রদের মধ্যে শিশুর সারল্য, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা কিছুই নাই—সেজন্য বড় শক্ত কথা, তবু সর্বভূতে বাসুদেবের অবস্থান উপলব্ধি ঠিক না হোক, চিন্তাটা করার সাধনাও অন্ততপক্ষে রাখতে হবে।

সাধুরা তোমরা তো স্কুলে পড়াচ্ছ, শোন কতকগুলো new methods of teaching—যারা বোকা ছেলে তাদের মাথার পশ্চাৎ ভাগে পাশটায় ঠাকুরের নাম করে আস্তে আস্তে চাপড় মারবে, কারণ brain এর সূক্ষ্ম cells এবং চিন্তাগ্রন্থিগুলো মাথার পশ্চাতে থাকে। এইটী করে দেখলে ফল পাবে। আর নিজের চিন্তাশক্তি ধারণাশক্তিও বাড়াবে। দুটো বই নিয়ে একসঙ্গে পড়বে। তাহলে brain-এর double function অভ্যাস হবে। আমি কাশিপুরে থাকতে নীচে গ্রামোফোন বাজিয়ে ওপরে রোডও লাগায়ে হাতে একখণ্ড বই নিয়ে পড়তাম। তিনটে জিনিষ একসঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করতাম। তোমরাও করবে। কিন্তু ঠাকুরের নাম ছেড়ে করলে brain fail করতে পারে। এমনিভাবে চিন্তা করলে brain খুব sharp বা তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। তখন যাইকিছু কর, যে কোন পরিস্থিতিতেই থাক ঠাকুরের চিন্তা ভুল হবে না।

: ছাত্র-সমাজের ধর্মীয় মনোভাব প্রসঙ্গে :

দেখ, ধর্মটীকে বাদ দেওয়ার জন্য বর্তমানে দেশ ও রাষ্ট্রের এই দুর্দশা। ধর্মটী ছোট থেকেই ছেলেরা যদি শিক্ষা পায় তাহলে অনেকটা শান্ত নম্র হতে শেখে ; মা বাপকে মানা, শিক্ষককে মানা সহজ আসে। আমি সাধু হয়েছি কিন্তু কর্তা (বাবা) বা মা এলেই প্রণাম করতাম, তারপর স্বামিজী যখন হিমালয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন. শুনে মা, কর্তা এরা সব কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের মনে দুঃখ দিয়ে গেলাম না, কিন্তু আমার সাধু হওয়া তো তার জন্য আটকাল না।

বর্তমানে মা-বাপের মনেই ধর্মভাব নাই, শিক্ষক সমাজের মধ্যেই ধর্মীয় মনোভাব নাই, ছাত্রেরা কি শিখবে ? রাষ্ট্র ও ধর্ম নিরপেক্ষ। কাজেই দুর্দশা তো হবেই। এখন বেশীর ভাগ সকলের মনোভাব ধর্ম সেতো বুড়ো বয়সের আচরণীয়। কিন্তু ছোট থেকে প্রস্তুতি না থাকলে বুড়োবয়সে কি কিছু হয় ? ছোট থেকে অভ্যাস রাখতে রাখতে বুড়ো বয়সে সেটা কে বাড়ানো যেতে পারে। আমার মনে হয়, বর্তমান শিক্ষাধারার সঙ্গে সনাতন পদ্ধতিও কিছু কিছু বজায় রাখার চেষ্টা রেখে গেলে দেশের সত্যিকার কল্যাণ হবে।

—:০:—

"যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

রঙ্গীন পাখী

স্বামী সাধনানন্দ

ওরে ও রঙ্গীন পাখী থাকি থাকি
মেঘের সনে কহিস কথা
নিয়ে যা মোর বারতা ॥
সেই শ্যামলে চিনিস কি তুই
তোর পাখায় কি তার চরণ রেখা
রিমি ঝিমি বরিষণে তারেই কি তোর পড়ে মনে
মেঘের মেদুর শ্যামলীমায় তাই কি রে তুই মেলিস পাখা ॥

তোর শ্যামল মনের শ্যাম আঙ্গিনায় নিয়ে কি তুই
যাবি আমায়
যেন শ্যামলতার ছায়াপাতেই মনে পড়ে চরণ রাঙা ॥
দিনের শেষে তোরই মত তারেই যেন ডাকি কেঁদে
জানি না কোন সে ক্ষণে সেই চরণে, ঢালব ওরে ঢালব
আমার সকল বাধা
সেদিন শেষ হবে মোর মালা গাঁথা ।

যোধপুর, ২৯।৭।৪৯

—১০:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিন নয় যেন সোনার পাপড়ি
উষসীতে ফুটি সাঁঝে পড়ে ঝরি
চন্দ্রমল্লী কত না রাত্রি মদমুকুলিত মনে ।

দিগন্ত সাথে মধু মিতালিতে
ভ'রে তোলে ক্ষিতি রূপে সুরভিতে
ভাঙা মেঘগুলি রাঙা হ'য়ে দোলে জ্যোৎস্নার চুম্বনে ।

কত সুললিতা মাধবীর লতা
নিদাঘ বেদনে হ'ল অবনতা
শষ্প শ্যামল কত প্রান্তর উর্ম্মিল তটিনী তীরে ।

রূপশালী মধু গন্ধে আকুলি
কাদম্ব কল কাকলিটী তুলি
কার আহ্বান তুল মাজিয়া হেমন্ত লক্ষ্মীরে ।

দক্ষিনাপুরের তটভূমী ঘিরে
বকুল বিভল মুগ্ধ সমীরে
কমলোজ্জ্বল দু'চরণ ঘেরি শত মন মধুকর ।

তোলে গুঞ্জন মনমন্থিত
হরি রস রাসে আনন্দচিত
ওঠে মর্ম্মরি পঞ্চবটের ছায়াতুর অন্তর ।

সন্ধ্যার ভাঙা অলিন্দ ছায়
একটি কান্না গুমরিয়া হায়
যে ডাক পাঠালো গৃহে গৃহান্তে দিকে দিকে তারি সাড়া ।

লীলার সাগরে ঢেউগুলি ছুটে
একে একে আসি ভিড়িছে এ তটে
দ্বিতীয়ার চাঁদে ঘেরিয়া বসেছে দ্বাদশটি করা তারা ।

এসেছে নরেন, কালী ও রাখাল
সারদা, যোগীন, শশী ও গোপাল
দরদী ভক্ত বাবুরাম এল, এল সে নিরঞ্জন।

এসেছে শরৎ, লাটু ও তারক
এই তো ধরার নব ব্রজলোক
মহা অমৃতের উদধিতে আজ আনন্দ মন্থন।

প্রভুর দেউলে চলে কোনোদিন
হরিনাম লীলা বিরামবিহীন
ভাবে টলমল গদাধর গোরা নাচে কীর্তন মাঝে।

ঢলি ঢলি পড়ে নন্দিত কায়
সে দিব্য তনু ধরা নাহি যায়
কলুষ পরশ ভাবময় প্রভু সহিতেও পারে না যে।

পরশিতে শুধু পারে বাবুরাম
শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সে প্রাণ
প্রভুর দরদী তাই সে আগলি রহে সে দিব্য তনু।

কিশোর ভক্ত দেহটী সঠাম
ব্রজভাবে তার ভরা মন প্রাণ
মধুকরহীন কুসুম যেন সে ভরা পারিজাত রেণু।

রোমাঞ্চ মধু প্রভুর অঙ্গ
পরশিতে যাহা নারে অনঙ্গ
ভাবময় সেই তনুটি আগলি রহে নিতি বাবুরাম।

কচি বুক তার কেঁপে হয় সারা
ডাগর নয়নে বহে প্রেমধারা
প্রভুর কর্ণে কহে অস্ফুটে হরি হরি মহানাম।

কীর্তনময় সুরধুনী কূলে
নাম তরঙ্গ নিতুই উছলে
সে নাম আবেশে ভুলে যায় মাঝি জোয়ারে ভাসাতে তরী।

কুসুম স্ফুরিত অংবর কানন
দখিনার লোনে সে নাম নিস্বন
মধু ভুলে প্রেম সুধা লোভে ছুটে আসে ঐ চকরী।

* * * *

আরো কতদিন আসে বাবুরাম
তারো তরে যে গো প্রভুর পরাণ
ক্ষণিক বিরহে হয় গো পাগল মরমী বোঝে যে কথা।

মনের কথাটি কহিতে যে মানা
দরদী বিনা যে প্রাণই বাঁচে না
মনে মনে তাহা বোঝে বাবুরাম, বোঝে সে প্রভুর ব্যথা।

তাই ছুটে আসে ফেলি গৃহকাজ
রহে না যে মন পুরজন মাঝ
তারেও দেখিতে ছুটে যান প্রভু এমনি দোঁহার টান।

মরমীর মুখ মরমীই চেনে
ভক্তের দেব দেহ লক্ষণে
চিনেছেন প্রভু দেবীর অঙ্গ সম্ভূত বাবুরাম।

দেখেছেন তিনি ধ্যানের আবেশে
অনুপম এক আনন্দ রসে
দাঁড়ায়ে ভক্ত প্রকৃতির বেশে কণ্ঠে রতন হার।

সাথে সহচরী মুখে মৃদু হাসি
শ্রীতনু জ্যোতিতে দিক পরকাশি
চিনেছেন প্রভু দেবী মূরতিতে ওরে বাবুরাম তাঁর।

তাই বুঝি শত বিনিদ রজনী
কেটে গেছে ধ্যান লগনটি গণি
অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদে শিখাতে সাঙ্গ লীলা।

কত সাবধানে পথ চলিবার
গোপন নির্দেশ দেওয়া বারবার
নিদাঘ কুসুমে হরনাকো যেন কামনার মসী ঢালা।

মান অভিমান কত আব্দার
চলে দোঁহ মাঝে তুলনা কি তার
এই তো সেদিন কহে বাবুরাম প্রভুর চরণ ধরে।

ভাব সমাধির গোপন সে চাবি
তব কাছে আছে জানি স্বামি সবি
দাও তবে খুলে হে দয়াল মোর একবার দয়া ক'রে।

সুস্মিত দুটি অধরে দেবতা
কহিলেন,—"ওরে শোন্ মোর কথা
বিনা জননীর কারো ইচ্ছা হয়না'কো কোনও কিছু।

কেন বৃথা তোর এই চপলতা
দেবার যেটুকু সেই দেবে যে তা
কেন বৃথা তুই বাড়াবি বেদনা ছুটে আলেয়ার পিছু।"

তবু বাবুরাম অবুঝ যেন গো
কোনো কথা মন শোনে না কেন গো
শুধু কর তুমি বলিলেই হবে বল শুধু একবার।

ভক্তের কথা পাশরিতে নারি
মা'র শ্রীচরণে জানালেন হরি
বাবুরাম তরে ভাবসমাধির প্রার্থনা করবার।

রহস লোকের অচিন দুয়ারে
দাঁড়ায়ে জননী কহিলেন তাঁরে
প্রেমিক ভক্ত শ্রীবাবুরামের ভাবের কথা নয়।

তার হবে জ্ঞান, প্রেমে আর জ্ঞানে
এক হয়ে বুঝি যাবে সেইখানে
শুনি বাবুরাম নীরব নয়নে থমকি দাঁড়ায়ে রয়।

* * * *

দক্ষিনাপুরের লীলার আসরে
সমবেত শত ভক্ত মাঝারে
ভক্ত হাজরা ছিল শ্রীপ্রভুর লীলা পোষ্টাই তরে।

এহা তীর্থে তারও প্রয়োজন
প্রভুর দুয়ারে তাহারও আসন
বিছানো রহিত সবারি মতই সুযোগ্য সমাদরে।

জমায়তো সে ভিড় ধর্ম্মের ভানে
আপাত মধুর উপদেশ দানে
রস ভরে প্রভু শত কৌতুকে কহিতেন হাসি সুখে।

"হাজরা কি কম? রটেছে এখন
অনেক উচ্চে তাহার আসন
বড় দরদাটি যদি হই আমি, ছোট দরদা যে তবে।

নিজ মুখে সে তো বলেছে আমারে
কার কত জ্ঞান বুঝেছে বিচারে
তার জ্ঞান পাঁচসিকে পাঁচ আনা, নরেনের ষোল আনা।

সে হিসাবে আমি অনেক নিম্নে
একটু লালচে ব'য়েছে এ মনে
তার বেশী নয়। তাই ভাবি মোর কিবা হবে দশাখানা।

হাসিয়া লুটায় ভক্তের দল
শুনিয়া প্রভুর কুতুক তরল
রঙ্গেতে ভরা মিঠে কথাটির অনুপম ভঙ্গীটি।

প্রভুর মুখেও উজ্জ্বল হাসি
আনন্দে যেন ভাসে দশদিশি
লীলা পোষ্টাই হয়না তো বিনা কৌতুক সঙ্গীটি।

এই হাজরাই কোনো এক ক্ষণে
কহে বাবুরামে ডাকি নিরজনে
বালক তোমরা জানোনা তো কিছু কি চাহিতে হয় কোথা

তোমাদের ঐ ঠাকুরের কাছে
সিদ্ধি শক্তি কত কি যে আছে
চেয়ে লও বাপু এই বেলা ভাবি ভবিষ্যতে কথা।

তাহা নয় শুধু হাসি খেলা গান
এই লয়ে কেটে গেল দিনমান
সাধকে জীবনে সিদ্ধি শক্তি বিনা কি মানিবে কেহ।

সাবধানে চেয়ো পড়োনা ফাঁকিতে
সব চাবি জেনো ওঁরই হাতেতে
শুনিয়া সে কথা বাবুরাম মনে জাগিয়া উঠিল মোহ।

পশিল সে কথা শ্রীপ্রভুর কানে
চুপে কহিলেন ডাকি বলরামে
রাজার পুত্র ভিখারীর মত পাতিস্‌নে যেন হাত।

আমার যা কিছু সবি যে তোদের
পাবেরা তোদের সারা জীবনের
না চাহিতে তোরা সকলি তো পাবি মিটারে সকল সাধ।

প্রেমের জাকেতে কষিলে হিসাব
দুটি মনে জেগে ওঠে ভেদ ভাব
কি গূঢ় বাঁধনে বাঁধা যে আমরা সেটুকু রাখ্ জেনে।

বুঝে নে তোদের কিবা অধিকার
কেবা পর আর কেবা আপনার
দোঁহার পরাণ দোঁহারে যেন রে প্রতিক্ষণে লয় চিনে।

শুনি বাবুরাম নীরব নয়নে
চেয়ে রয় শুধু প্রভুর বয়নে
সে চাহনী যেন সঁপে দেয় সারা জীবনের সব চাওয়া।

দরদীর মন দরদীই বোঝে
আনজন শুধু আনকথা খোঁজে
চুপি চুপি দেখা এক ঘরে যায় দুটি মনে দেওয়া নেওয়া।

(ক্রমশঃ)

রসো বৈ সঃ

'লুকোচুরী'

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীসাধনাপুরী

মনে পড়ে যায় বেশ কয়েক বছর আগের এক অমাবস্যার রাতের কথা—গোঁসাইকাকা ও কামিনীদা (বৈদ্যনাথ ও কামিনী দেবাংশী) তখন শ্রীঠাকুরের দুটি চারণ ভক্ত শ্রীঠাকুরকে খুব গান শোনাতেন। শ্রীঠাকুর যত নতুন ভজন কীর্তন, সারদা সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ সঙ্গীত, আধুনিক, কালী-কীর্তন ইত্যাদি লিখতেন তাঁরা দুজনেই সুর সংযোগ করে শুনিয়েছেন—দিনে সন্ধ্যায় এমনকি কখনও কখনও সমস্ত রাত্রি ধরেও। নিদ্রা যে শ্রীঠাকুরের দিনলিপিতে এক রকম কল্পনাতীতই ছিল তখন।

যাইহোক একদিন পাঠ, ভজন ভোগারতি সব হয়ে গেছে, শ্রীঠাকুর ভোগ নিলেন ও নীচে নেমে এলেন হাত মুখ ধুতে। মাত্র মিনিট কয়েকের অনবধানের মধ্যেই শোনা গেল, 'ঠাকুর কোথায় লুকিয়ে পড়েছেন।' সকলে মিলে তখন সমস্ত আশ্রম খোঁজাখুঁজি শেষে করে আমরা ছুটলুম সাঁইথিয়ার রাস্তা ধরে—শ্রীঠাকুরের বাউল মনতো সহরের দিকে আকর্ষিত হবে না—

'মেঠোসুরের ভাটিয়ালী
ভুলালো মন ভুলালো'

এ যে তাঁরই লেখনীর ভাষা—তাই সুবনাদি, শরণাদি, অর্চনাদি, আমি, গীতা, সতীমা, শোভামা, অগ্রপূর্ণামা পন্ডিতমা প্রমুখ কয়েকজন ছুটলুম। বিমলদা, (মহামায়া), আরাধনা, মীরা, অমল ও গাধু এরা অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছিল কাজেই জানতেই পারল না। যাইহোক গভীর রাত—রাস্তায় লোক চলাচল নেই—কাজেই খুব তাড়াতাড়ি এক রকম ছোটার মতই চলতে কোন অসুবিধা হল না। সহরের শেষে দত্তপুকুর ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই দেখি—শ্রীঠাকুর চলেছেন আগে আগে আর পেছনে হারমোনিয়াম কাঁধে করে চলেছেন কামিনীদা, ফটিকদা ও প্রেসিডেন্ট মহারাজও রয়েছেন। এতগুলি পদ শব্দ পেয়ে শ্রীঠাকুর পেছন ফিরে হাসলেন—সঙ্গ নিয়েছি বলে আনন্দিত হলেন। বেশ কিছুটা চলার পর শ্রীঠাকুর বসলেন ধানক্ষেতের কাছে কিছুটা পরিষ্কার জায়গা দেখে আর কামিনীদাকে বললেন, 'কামিনী আমি এইখানে বসি আর তুমি ওই দূরে পুকুরের ধারে গিয়ে বসে গান শোনাও—অনেক সময় দূর থেকে গান শুনতে বেশী ভাল লাগে।' কামিনীদাও শ্রীঠাকুরের কথামত পুকুরের ধারে গেলেন আর শ্রীঠাকুর যেখানে বসলেন সেখান থেকে একটু তফাতে আমরাও বসলুম। অমানিশার নিবিড় কালো রাত—হেমন্তী আকাশের তারা জ্বলা মন কাড়া রূপ আর মাটীর বুকে শিশির ভেজা ধানের সুগন্ধ—বড় ভালো লাগছিল

শ্রীঠাকুরের। কামিনীদা গান ধরলেন শ্রীঠাকুরের রচিত গানখানি—

অমাস্পন্দিত ঘন রাত্রি
চির চঞ্চল আমি যাত্রী
এই বিস্মরণীর তীরে—ইত্যাদি

কামিনীদার গলা কাঁপছে—শ্রীঠাকুর বললেন, 'ওরে ভয় পেয়েছে রে, যাও ফটিক কামিনীর কাছে গিয়ে বসগে—ও ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে।' ফটিকদা গেলেন। পর পর দুটি তিনটি গান ও কালীকীর্তন শোনা গেল। আজ শ্রীঠাকুর ধ্যানমগ্ন হলেন না। খালি দু চোখ ভরে দেখলেন নিবিড় অন্ধকারের রূপ!

এত অন্ধকার কাছের মানুষ নজর হয় না। তিন চারটি গানের শেষে ঠাকুর বললেন 'কামিনী আর থাক। এসো এবার ফেরা যাক্।'

কামিনীদা কাছে এলে বললেন, 'কামিনী তুমি ভয় পেয়েছিলে?' কামিনীদা বললেন, 'হ্যাঁ ঠাকুর, একে অমাবস্যার রাত—তাতে ওই পুকুরটার সকলে মুখাগ্নি করে—তাই গা ছমছম করছিল, আর আমি কারোকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।' শ্রীঠাকুর হাসলেন ও বললেন, 'আচ্ছা এবার ফেরা যাক্।'

শ্রীঠাকুরের এ সব কথার পর আমরা অন্ধকারের রাত্রির মহাসৌম্যময়ী রূপ দর্শন করতে করতে ফিরলুম আশ্রমে।

মেঘজলে শরতের লুকোচুরী খেলা হয়েছে শেষ কিন্তু শ্রীঠাকুরের মনে জাগল লুকোচুরী খেলার সাধ। সেই কথাটি আজ মনে পড়ছে। ১৩৬৪ সালের দুর্গা পূজা সারা হয়ে গেছে। পূজার সময় থেকে বিশ্বনাথ মামা সিউড়ী আশ্রমের কাছে একটি বাড়ীতে এসে আছেন। কালীপুর বাড়ীর ছোটকাকীমা আশামা ও গৌরী এঁদের ইনি মামা হন—সেই সূত্রে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আশ্রম ভক্তগোষ্ঠীর ও সাধু-সজ্জনের সকলেরই কাছে তিনি মামা বলে পরিচিত, সেই বিশ্বনাথ মামা এসেছেন সিউড়ীতে—শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রগতি ও দিব্য আনন্দ লাভের আশায়।

শ্রীঠাকুর সেদিন স্নানের আগে বললেন, 'বিশ্বনাথ আমার জন্য এখানে এসে আছে, যাই ওর কাছে একটু ঘুরে আসি তারপর স্নান করতে যাওয়া।' এই বলে আশ্রমের গলিটুকু পেরিয়ে শ্রীঠাকুর মামার কাছে গেলেন। দরজা খুলে সামনে তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কাজেই একটু সরে এসে রুবী, যোগমায়া দাঁড়িয়ে আছে—মামার সঙ্গে কথা বলে শ্রীঠাকুর আসবেন এই চিন্তা নিয়ে কিন্তু পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট এইরকমভাবে আধঘণ্টা হয়ে গেল—শ্রীঠাকুর তখনও আসেন না দেখে ছোট ব্রহ্মচারীদের একজনকে রুবী পাঠিয়ে বলল, 'যাতো ঠাকুরের কাছে—স্নানের বেলা বয়ে যাচ্ছে—দেরী হয়ে যাচ্ছে আর কখন স্নান করবেন ভোগ নেবেন—যা দেখে আর কেন আসছেন না?' ব্রহ্মচারী গদাই কি শ্যামল হবে এসে বলল 'ঠাকুর ওখানে নেই, ঠাকুর মামার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন।' এই সংবাদে রুবী তো হৈ চৈ লাগিয়ে দিলে—ঠাকুর কোথায় গেছেন খোঁজ কর সকলে—ঠাকুর মামার সঙ্গে কোন দিকে গেছেন। ব্রহ্মচারী সদন, ভবন-এ সমস্ত খোঁজা হল কোথাও যাননি তাই আমি রুবী, যোগমায়া, গীতা, শরণাদি, সুমনাদি, ওদিকে প্রেসিডেন্ট মহারাজ, সুহাসদা ইত্যাদি বেরিয়ে পড়লাম যে পথটি কিছুটা নির্জ্জন সেই পথ দিয়ে খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে লোকালয় ছাড়াতেই সুরু হল ছুট। ছুটতে ছুটতে পানের বরুজের পাশে একজনকে দেখে রুবী চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখ মামা—কাজেই ওইদিকেই চল ঠাকুরকে পাব।' গীতা বলল, 'এই যাকে তাকে মামা বলছিস কেন, দেখছিস না লোকটা ক্ষেতে কাজ করছে—মুনীশ—মাথায় গামছা বাঁধা।' 'আরাধনা বলল—দেখছিস না লোকটা রোগা। মামা না হয়তো মহলা রঙ কিন্তু বড়লোকী নাদুস-নুদুস চেহারাটা যাবে কোথায়?' সকলের কথায় শব্দে লোকটি মুখ তুলে সামনে ফিরলো। তখন রুবীর ভুল ভাঙলো—জিব কাটছে 'ছিঃ ছিঃ খুব ভুল হয়ে গেছে'—যাইহোক রুবীর তখন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা ও তখন চট্ করে সেই মুনীশটাকেই জিজ্ঞেস করে 'হ্যাঁ বাবা, এখান দিয়ে একজন সাধুবাবাকে যেতে দেখেছ—গেরুয়া কাপড় পরণে, খুব সুন্দর চেহারা মুখে দাড়ি আছে। 'মুনীশটি তখন বলল, 'হেঁ মা, ঠাকুরবাবাকে আবার আমরা চিনব নাই—তোমার হাতে কত প্রসাদ খেঁইছি গো, বিজলীর পারা কিবে দেখতে! হো বাগে সেইছেন মা, ওই পানের বরুজের

হোই দিক পানে।' আমরা তখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম কে আগে যেতে পারে, এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু মাঠ পেরিয়ে পানের বরজের ওই পাশে গিয়ে দেখি ঠাকুর কাপড়ের আঁচল খানি তুলে মাথার দিয়েছেন রোদ লাগছে বলে আর মামা কাছে দাঁড়িয়ে, দুপুর রোদের মাঠ দেখছেন আর জপ করছেন শ্রীঠাকুর। আমাদের দেখে বলে উঠলেন, 'ওঃ তোরা এখানেও ধাওয়া করেছিস—আমি বিশ্বনাথের সঙ্গে চুপিচুপি একটু চলে এলাম একটু পরেই ফিরব ভেবে—তা কি করে এলি ?' গীতা বলল 'কেন হেঁটে।' যোগমায়া ও সুহাসদা বলল 'কেন—কিছুটা ছুটতে ছুটতেও এসেছি।' শ্রীঠাকুর সুহাসদাকে বললেন, 'সে কি সুহাস, ওদের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছুটতে ছুটতে আসতে দিলি কেন ?'

সুহাসদা বলল, 'ঠাকুর ওরা কি আমাদের মানা শুনছে। মানিকজ্যাঠাই বারণ করলেন। বিশেষ করে রুবী তো সেই বাঁধন ছেড়া গোরুর মত ছুটছে।' রুবী বলল, 'যা রে-গাড়ী-জুড়ি এসব করতে গেলে কি ঠাকুর পাওয়া যায় ?' শ্রীঠাকুর বললেন, 'তা তো এলি আর সব ? রুবী বলল, মায়েরা গোপালের ভোগ রাঁধছেন আর অর্চনাদি পূজো করছে কি করে আসবে ?' সুহাসদা বলে উঠল—'মামা, এ আপনি করলেন কি বলুন তো ? দুপুরে রোদে ছাতা নেই আর একলা একলা এমনি করে ঠাকুরকে আনে কখনও !' 'মামা বললেন, 'ভাই ঠাকুরকে তো তোমরা আমার চেয়েও ভালো জানো ভাই !' ঠাকুর যখন বললেন—'চল বিশ্বনাথ তোমাতে আমাতে একটু ঘুরে আসি। একটু মায়াকরী করলে হয়না—আমি কি বলব বলতো—যে না ঠাকুর আমি যাব না। আমি শুধু শুধু একবার বললুম, কারোকে না বলে ফেলে মায়েরা ভাববেন, তাছাড়া আপনার কষ্ট হবে। তাতে যদি ঠাকুর জোড় করেন আমি কি করতে পারি ভাই বল। আর এইরকম একলাটি ঠাকুরের সঙ্গে ঘুরতে কার না সাধ হয় বল। তখন তুমি-ই কি না বলতে পারতে ? তা আমি আর ঠাকুর চলছি দু চারটি বাড়ীতে নাম করে ভিক্ষা চাইলুম কিন্তু কেউ শুনতে পেল না, সাড়াও দিলে না ভিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা—এই সব ভক্ত বাড়ী সামন্তদের বাড়ী, কুণ্ডুদের বাড়ী এমন এক বাড়ীরও দোর খুলল না।'

সুহাসদা বলল—'ভাগ্যে থাকলে তো দরজা খুলবে। ঠাকুর, 'এইবার চলুন, বেলা হয়ে গেছে।'

শরৎ তখনও যাই যাই করেও যেন যায়নি ; দীঘিভরা পদ্ম, সোনালী ধানের ক্ষেতে ঢেউ জাগানো ঝুম ঝুম নাচ—নানা রকম পাখীর কলকাকলি শ্রীঠাকুরের মনকে নিশ্ছিল কেড়ে, শ্রীঠাকুরের চোখে মুখে তখন সারঙ্গের উদাস আভাষ—হয়তো মনে পড়ে যাচ্ছে বৃন্দাবনের মধু বনে গোচারণের ছলে বাঁশরী সাধনা। যাই হোক অনেক কষ্টে রাখালিয়া মনটিকে সংবৃত করে বললেন,—'চল তবে।' শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতেই সেদিন ফিরেছিলুম আমরা।

১৩৭৬ শ্রাবণের সেই কালো রাতের বুকে রঙ্গ চপল চোর কানাইয়া আমাদের ভুলে লোকান্তরে গিয়ে এমনভাবে লুকিয়ে গেলেন যে এত খুঁজি কিন্তু একটিবারও ধরতে পারিনা। গভীর রাতির বুকে কত কতদিন আঁতি পাঁতি করে খুঁজি ভাবি তাঁর নিজের সাধে গড়া মণি-মন্দির, তাঁর এত সাধের লীলা-ক্ষেত্র, তাঁর এত প্রিয় জ্যোৎস্না ধোওয়া গাঙিনীর চর, হয়তো একটি বারও ধরতে পারব বা দেখতে পাব কিন্তু শুধুই বৃথা চেষ্টা—মনে মনে ভাবি হয়তো ঠাকুর জ্যোতির্ময় দেবদূতদের সঙ্গে খেলছেন—হয়তো কোন সপ্তর্ষির চূড়ায় চূড়ায় অমৃত নির্ঝরের তীরে তীরে পারিজাতের কুঞ্জ-কাননে আছেন বসে এখন কি আর আমাদের মত ধূলার সঙ্গীদের কথা মনে আছে ?'

ক্বচিৎ কখনও অচানক একরাশ সুগন্ধ ছড়িয়ে জানান ওরে এই তো আমি কই ধরনা—ক্বচিৎ কখনও একটু দোষের আওয়াজে হয়তো জানান এই তো আমি কই ধরনা—কিন্তু ধরতে পারি না—মুহূর্তে সব হারিয়ে যায়। এখন আর তাঁকে ধরবার কোন উপায় দেখি না—যতক্ষণ না এই ধূলো দেহের বন্ধন ধূলো জগৎবুদ্ধি ছাড়তে না পারছি সেই রঙ্গচপল রাগরঞ্জনীরাকে আর ধরতে পারব না। এখন শুধু সুহৃদাসের মত অভিমানী মনটা গুমরে ওঠে—

'বাঁহ ছুড়াকে যাত হো
নিবল জানে কো মোহি।
হিয়রসে যব জাহুগে
মরল বদোসে তোহি॥'

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

ধম্মপদং

শ্রীশ্রীঠাকুর

সংযত চিত্ত সুখদ হয়
শান্তি বিহীন সতো অস্ত্র
প্রজ্ঞা কখন পূর্ণ নয়॥
কামনার যত পুষ্প শর
ছিন্ন করে যে—তন্দ্রা মুক্ত
গন্ধ গহন পুষ্প ভ্রমণে
ভ্রমরের মত মুনি যে রয়॥

সুভাষিত বাণী সফল যে জানি
রুচির ফুল সে পুণ্য মানি
শীল আচার কুসুম গন্ধ
প্রতিকূল-গামী নিতি যে বয়॥
সত্যধর্ম্ম অজ্ঞজনের
সংশয় পথ দীর্ঘ প্রাণ্ত
দর্পী সমান মূঢ় যে মন
হয় না কখন শর্ম্মময়॥

ধম্মপদং-এর মর্ম্মে লিখিত।

—:০:—

শ্রীচৈতন্যের আলোকে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ-সত্যানন্দ

স্বামী মহানন্দ

[শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০ তম আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বতীর্থসার শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাষণ]।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু উপস্থিত ভক্তজন ও মঞ্চে উপস্থিত সাধু মহাত্মা সকলকে আমার প্রণাম জানাই। এই আনন্দ-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, ভগীরথ যিনি এখানে ভক্তিস্রোতের প্রবাহ এনেছেন সেই শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজকে আমার ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানাই ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট অতিথি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং। তাঁর কাছে নিবেদন—'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' /…এই যে করুণা চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে'। 'দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া, তোমারী লাগিয়া একেলা জাগে।' অপর বিশিষ্ট অতিথি—'এক পুণ্ডরীকম্ আসি'—অম্বিতীয় পদ্ম আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ—যুগপুরুষ স্বামী সত্যানন্দদেব। তাঁর কাছে প্রার্থনা—'ও নীরব কথা বলো, দুয়ার খোল'। আজ আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চ প্রদীপের আরতি করবার। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, স্বামী সত্যানন্দদেব, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই পঞ্চ দেবতার আরতি অর্চনা করবার। বৈকুণ্ঠ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমার জীবন সার্থক। মঞ্চে এই দলো, আর আমি সামনে দেখছি দেবলোক থেকে এসেছেন অনেক শ্রোতা যাঁরা ভক্তের নামকীর্ত্তন শুনে, প্রেম-আস্বাদন ক'রে তৃপ্ত হন। সামনে পশ্চিমের গোল ঘরটিতে ছোট খাটে বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নীচে বসে আছেন—নরেন, কালী, বাবুরাম, শ্রীম, কেশব সেন, বলরাম ইত্যাদি।

১ই ডিসেম্বর, রবিবার ১৮৮৩ খৃ—ঠাকুর বলছেন—চৈতন্য ভক্তির অবতার জীবকে ভক্তি শেখাতে এসেছিলেন। নহবতের পাশে দাঁড়াইয়া ঠাকুর—'গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম ভাবে নয়, এই সাদা চোখে—বটতলা থেকে বকুলতলা ফিরে যাচ্ছিল।'

নহবতের ছোট্ট ঘরে অনেক আড়াল রেখে মা সারদাও এসেছেন আজকের এই সংসভায় 'গৌরাঙ্গের' সাঙ্গোপাঙ্গকে' দেখতে। মা'র ছেলের কথা শুনতে। ছেলে যখন অস্ফুট স্বরে 'মা' বলে তখন ত' মায়েরই সবচেয়ে আনন্দ—তাই মা সারদা গৌরদাসীকে, লক্ষ্মীদিদিকে নিয়ে সামনের সারিতে বসে গেছেন।

কোন বিশেষ যুগের পটভূমিকাতে যুগপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল, স্বাভাবিক-ভাবেই সমাজ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যুগপুরুষ তাঁরা কর্মধারা পরিবর্তন করেন। সমাজের বেদনা তাঁকে আকর্ষণ করে। সেজন্য ঐ যুগপুরুষগণের জীবন হল সমাজ-বেদ, তাঁদের জীবনই চলমান শাস্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম হল আত্মবিস্মৃতি, পরানুকরণ প্রিয়তা। একদিকে খ্রীষ্টধর্ম, পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ, অপরদিকে হিন্দুধর্মের অজ্ঞতাজনিত ধর্মীয় সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুক—মানসিকতা, যার ফলে দেখা দিয়েছিল এক নিদারুণ অবক্ষয়। সমাজ দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি স্তম্ভের উপর। সেগুলি হচ্ছে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়চেতনা ও অর্থনৈতিক। এগুলি হল সমাজের শক্ত বুনিয়াদ। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূলে আছে এই পটভূমিকা।

শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এঁরা হলেন, সার্থক ভাবে ভারত-পথিক পথ-পরিক্রমায় তাঁরা যেমন রাজকীয় অভ্যর্থনা পেয়েছেন, তেমনি তাঁরা অবহেলিত মানুষের উষ্ণ-সান্নিধ্যও পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই পরিক্রমাকালে কোনরকম সম্বল নিয়ে ছিল। অর্থকে বর্জন ক'রে মানুষের দরজায় দরজায় তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। আর অনিকেত, নিরাশ্রয় হয়ে গাছতলাতেই তাঁদের সব কিছু। কোন বিলাস বহুল হোটেলে বিশ্রাম তাঁরা নেন নি।

আপনারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন, শ্রীচৈতন্যের আচণ্ডালে কোল, আর বিবেকানন্দ আরম্ভই করছেন—'চণ্ডাল ভারতবাসী, মেথর ভারতবাসী আমার ভাই'। এতে আশ্চর্য কিছু নেই—পূর্বসূরীর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতেই ত' আসা, যেন একই কণ্ঠ।

এই দক্ষিণেশ্বরে ঐ সাধনের বারান্দায়—'নরেন ও আরো কয়েকজন ভক্ত আলোচনা করছেন—'নামে রুচি, জীবে দয়া'—হঠাৎই ঠাকুর বাহিরে এসে নরেনকে বলছেন—'জীবে দয়া কিরে জীবে সেবা'—দয়া করবার তুই কে? নরেনের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত জগৎ জুড়ে যে একজাতি তার নাম মানুষজাতি। জগতের মানুষের সেবাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বিবেকানন্দ-ভাবনাতে শিবজ্ঞানে জীবসেবা আজ একটিই মন্ত্র। চৈতন্য সংস্কৃতির ননাদিকের মধ্যে একটি বিশিষ্ট দিক হল—এর মানবিক মূল্যবোধ। (Sense of Human Values). চৈতন্যদেব প্রদর্শিত পথটি হচ্ছে বিরোধ বিতর্কের পথ নয়, প্রতিষ্ঠার পথ, প্রেমের পথ।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে হুসেন শাহের আমল থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিজাতীয় শাসনকালে, শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি তার বিশাল বৈষ্ণবসাহিত্য, পাগল করা কীর্তনসংগীত, বৈষ্ণবদর্শন, আর সবচেয়ে বড়ো কথা সাম্য প্রেম ও ভাবভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই সমাজ ব্যবস্থায় ছিল না ঘৃণা, ছিল না উপেক্ষা, ছিল না কোনরকম উদাসিকতা। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়াই ছিল চৈতন্যসংস্কৃতির অবদান।

ইংরেজ আমলে আমরা ভারতের হিন্দু মুসলমান এক হতে পারিনি কুর রাজনীতির পথ ধরে ভারত বিভাজের দ্বারা তার সমাধান করেছি। আর চৈতন্য যুগে রাষ্ট্রপতি যখন মুসলমান তখন মৃদঙ্গের বোল ও কীর্তনসংগীত সারা বাংলায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে অভিনন্দিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় টাকা ও বল মানুষের মধ্যে একটা ফাঁক তৈরী করে দিয়েছে। মানুষের চিন্তায় ও আচরণে একটা অদ্ভুত হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। অন্তরের বোবা কান্নায় মানুষ আজ অসুস্থ। এমনকি সারস্বত পরিবেশে এবং ধর্ম মণ্ডলেও আজ মানুষ কৌলীন্য মর্যাদায় সমাসীন।

মনের মানুষ আজ আত্মগোপন করেছে। চৈতন্য সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো গৌরব এই ত্যাগে, সেবায় রঞ্জিত

এই সোনার মানুষকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সোনার ধানের দেশ এই সোনার বাংলার সোনার মানুষের জয়গানে তাই বৈষ্ণব ও বাউল তার একতারাতে একটিই সুর ধরেছিল—যা অত্যন্ত সহজ—সে সবাইকে বলতে শিখিয়েছে—'তুমি আমার, আমি তোমার।'

অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, বেদান্তের প্রচার ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য সেখানে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদের সাদৃশ্য কোথায়?

এ প্রসঙ্গে আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বটি আলোচনা ক'রে দেখাতে চেষ্টা করব যে মূলতঃ একই সুরের অনুরণণ শোনা যাবে এই দুই যুগপুরুষের চিন্তাতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের। এই ভেদাভেদ-বাদ অচিন্তনীয়। বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্ত বিচার এবং সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দান কালে মহাপ্রভুর এই অভিমত প্রকাশ পায়—

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ"

জীব ব্রহ্মের সম্পর্ক সেই রকম। মৃগনাভি কস্তুরী ও তার সুগন্ধ এ দুটিকে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না।

আবার দূরবর্তী স্থানে রক্ষিত কস্তুরীর সুগন্ধ যখন পাওয়া যায় তখন সেই সুগন্ধ যে কস্তুরীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একথাও মনে করা যায় না। কিন্তু কস্তুরী ও তার গন্ধকে পৃথক করা যায় না। তেমনি অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। এ উপমা ঠাকুর রামকৃষ্ণও দিয়েছেন। জীব ও ব্রহ্মেরও তেমনি একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ। এই ভেদাভেদ আবার অচিন্তনীয়। সেজন্যই এই তত্ত্বের নাম 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।' সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সারসূত্র এই তত্ত্ব। স্বামী সত্যানন্দ তাঁর বেদছন্দাতে এই তত্ত্বের নাম দিলেন "ছায়াবাদ"। সত্যানন্দ বলছেন,—'এই জগৎ ব্রহ্মের কথাচিত্র। ব্রহ্মই একাধারে এই চিত্রের অভিনেতা, গ্রহণাগার পরিচালক সবই। তিনি পূর্ণ ও সত্য সম্পন্ন, তাই তাঁর সঙ্কল্পমাত্র চিত্র বিকলিত হয়েছে এবং হচ্ছে তাতেই, লীলাভিনয়ও করছেন তিনিই।... আবার দ্রষ্টাসাক্ষস্বরূপ হয়ে তাঁর নিজের অভিনয় নিজেই দেখছেন, উপভোগ করছেন। যেমন কথাচিত্র তোলার পর কথাচিত্রের অভিনেতা তাঁর নিজের অভিনয় দেখেন আর আনন্দ করেন তেমনি ব্রহ্ম ও দৃশ্য সৃষ্টিরূপে প্রকাশমূর্তিতে এবং দ্রষ্টাসাক্ষী হয়ে স্বানুভবানন্দে অধিষ্ঠিত আছেন সৃষ্টির বাইরে ও ভিতরে ওতপ্রোতরূপে।'[১]

আমার পূজনীয় ভক্ত গোপীগণ, আপনারা একবার ঐ পদ্যটীর দিকে তাকিয়ে দেখুন—আচার্য তোতাপুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাতে দীক্ষিত করছেন। আবার শিষ্য রামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে শিক্ষা দিলেন—"কালীব্রহ্ম-ব্রহ্মই কালী" সর্বতীর্থসার এই দক্ষিণেশ্বর ধর্ম-অনুশীলনের এক আশ্চর্য পরীক্ষাগার (ল্যাবরেটরী)—সত্যসাধনার পাঠশালা। আবার দেখুন, আর একটি দৃশ্য—ভৈরবী ব্রাহ্মণী, এই নাটমন্দিরে আহূত পণ্ডিত-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী জানিয়েছেন—'এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।'

স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্য প্রদর্শিত ভালবাসা ও ভাবৎ প্রেম সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থে বলছেন—একাত্মতার অনুভূতির (feeling of oneness) নামই ভালবাসা অথবা প্রেম। এই প্রেমের পরিপূর্ণ মূর্তি পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যেই জীবন্ত ও সচল হয়ে উঠেছিল। নারদ 'যথা ব্রজ গোপিকানাম্' বলে প্রেমের প্রকাশ ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলছেন—

'Through love we Create a spiritual reality.
love is not merely flame meeting flame but spirit Calling to spirit.

১। বেদছন্দা—স্বামী সত্যানন্দ—"ছায়াবাদ"

বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস তাঁর গানে বলেছেন 'পিরীতি সহজ কথা নয়,

"পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া / পরতে মিলিতে পারে"।

পিরীতি সাধনের সবচেয়ে বড়ো কথা—এই আপনা ভুলিয়া'—আপনাকে অহংকে, কাঁচা আমিকে ত্যাগ করতে হবে। তখনই হবে 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।'

"ঈশ্বর প্রেমের অপার্থিব দিব্যজ্যোতি অন্তরে উদ্ভাসিত হইলে জাগতিক আশক্তি ও বাসনার অন্ধকার মুহূর্তে মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সিদ্ধভক্ত জগতের সমস্ত মানুষ ও সকল পদার্থের মধ্যেই আপনার আরাধ্য দেবতাকে বিরাজিত দেখিয়া দ্বেষ হিংসাকে ভুলিয়া যান ও সমস্ত জীবকে সমান প্রীতির সহিত ভালবাসিতে থাকেন" স্বামী অভেদানন্দ আরো বলছেন—'ঈশ্বর ও ঈশ্বর প্রেম অবিচ্ছিন্ন ও এক, শুধু তাহাই নয় ঈশ্বরই প্রেম ও প্রেমই ঈশ্বর।" প্রেমকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের ধারণা হওয়া অসম্ভব।"[২]

যুগসমস্যা-সচেতন যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ অভেদানন্দ সত্যানন্দ তাই আর্ততাপিত মানুষকে আহ্বান করেন ও বলেন—পার্থিব সুখ কেবল অশান্তি দেবে, 'এসো আমি তোমাদের অসীম আনন্দ ও প্রেমের সমুদ্রে স্নান করাইব। এ ডাক—কোন বিশেষ মানুষের কাছে নয়—এ ডাক বিশ্বের সকল মানুষের কাছে।

স্বামী সত্যানন্দ তাঁর কর্ম্ম পরিবেশ বেছে নিলেন—অবহেলিত গ্রামবাংলার মানুষের কাছে। সিউড়ী, কুণ্ডলা, বাতিকার, নরসিংহপুর, আমজোড়া, সেখানে থাকবে শুধু ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়, ছোট গ্রন্থাগার, প্রাইমারী স্কুল আর চলবে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে দেবোভব দরিদ্র, দেবোভব' মন্ত্রের রূপায়ণ। সহর কেন্দ্রিক সেবা প্রতিষ্ঠান হতে এই 'যারা দিল পেলনা কিছুই! তাদের বোবা কান্না শুনতে পাবে না। তাই সত্যানন্দ তাঁদের দরজায় পৌঁছে দিলেন তাঁর প্রেম ভালবাসা। সত্যানন্দ বললেন,—তোমাদের একটিই পরিচয়—'তোমরা ঠাকুরদাস' এদের মধ্যে এল—বিবেকানন্দ উচ্চারিত আত্মবিশ্বাস—এরা তথাকথিত ঈশ্বর প্রতিনিধিদের স্পর্শ পেল না ঠিকই কিন্তু তারা পেল শ্রীচৈতন্যের স্পর্শ'।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বললেন,—"বাউলের দল এল, চলে গেল, কেউ চিনতে পারলেন না।' আউল, বাউল সাঁই কত যে গোপন সাধক লীলা করে চলেছেন তার হিসেব এই পৃথিবীতে কতজন রাখছে।

স্বামী সত্যানন্দ বীরভূমে 'বটের বাউল' সম্প্রদায়কে নতুন ভাবে উদ্দীপিত করলেন, অলঙ্কৃত করলেন। নিত্যানন্দ বংশে জন্ম স্বামী সত্যানন্দের। সত্যানন্দ ভাব-ভাবনায় এই বটের বাউল আজ জয়দেব, দুবরাজপুর প্রভৃতি স্থানে এক ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে চলেছে আজও। সত্যানন্দ-সঙ্গীত, বাউল কীর্তন অজস্র তাদের কণ্ঠে পরিবেশিত হচ্ছে।

শ্রীঅর্চনাপুরী মা রচনা করলেন সত্যানন্দকে উদ্দেশ্য করে সংগীত—

'ও ফাগুনেরে তোর আগুন রাঙা যোগীয়া বাস দে পরি
আজকে কথা ছিল যে আসার
আমাদের এক বাউল রাজার
আমাদের এক প্রেমের রাজার
আমাদের সেই অচিন রাজার"

চৈতন্য সংস্কৃতির এক বিশাল অবদান এই বাউল সংগীত ও বাউল সাধন। 'মনের মধ্যে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।' এই সুবিখ্যাত পদটি রবীন্দ্র-ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে।

২। ভালবাসা ও ভক্তির প্রেম—স্বামী অভেদানন্দ পৃঃ ১৩

লক্ষ শূন্য লক্ষ-বাসনা নিয়ে আজকের পৃথিবীর মানুষ আজ দিশেহারা। সভ্যতা নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস আজ এই সুন্দর পৃথিবীকে এক ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ঘোর কুটীল পথ তার সামনে। আজ এই শুভ দিনে পাশ্বজনের সখা ভগবান শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বরিক প্রেমের পৃথিবী, ভালবাসার পৃথিবী গড়বার দায়িত্ব দিতে হবে। ভগবান শ্রীচৈতন্য সকলকে চৈতন্য দান করুন। আমি আজ আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীচৈতন্য, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীঅভেদানন্দ ও শ্রীসত্যানন্দকে পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি শেষ হতে না হতেই মা ভক্তারিণীর মন্দিরে আরতি শুরু হল। 'কোন কোন ভাগ্যবানের' মধ্যে এই বৈকুণ্ঠ দর্শনে আমি নিশ্চয়ই একজন ভাগ্যবান। অহংকার-স্ফীত মানুষের হয়ে প্রার্থনা জানাই—

"মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার-ভিক্ষা"

—:o:—

প্রেমের ঠাকুর

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী (কাব্যশ্রী)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

শীঘ্রই শ্রীঅঙ্গনের দৃশ্য-পট পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। সহসা বেজে উঠ্‌লো—মৃদঙ্গ ও করতাল। শ্রীগৌরাঙ্গের চতুষ্পার্শ্ব থেকে জেগে উঠলো ভক্ত-কণ্ঠের আনন্দ-মধুর নাম-সংকীর্তন! "হরি হরয়ে নমঃ—কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।" সকলের মধ্যেই একটা উন্মত্ততর ভাব! শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে বিভোর! সারা তনু টল্‌মল্ ক'রছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাশে পাশেই আছেন। নাম সংকীর্তনের লীলা রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত চল্‌লো। কারোর বিরাম ও বিশ্রাম নেই। সকলেই সংকীর্তনের মধুর রসে মাতোয়ারা! রঘুনাথও ডুবে গেছেন সেই রস-সমুদ্রের মধ্যে। অমৃত প্রেম যেন মর্ত্যলোকে প্রবাহিত হচ্ছে! ভক্তি-ধর্ম্মের একটি নিগূঢ় রস সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়েছে।

যখন পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের সূর্য্যোদয় হ'ল, তখন সংকীর্তন শেষ হ'ল! সকলেই চল্‌লেন গঙ্গা-স্নানে। শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন সকলের আগে। নবদ্বীপের পথের যত লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ-নয়নে দেখ্‌ছে আর প্রেমের ঠাকুরকে প্রণাম জানাচ্ছে। সহসা শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুনাথকে কাছে ডেকে বল্‌লেন—"আজই তুমি বিকেল বেলায় চ'লে যাও স্বস্থানে।"

রঘুনাথ এ আদেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন বিগত-রাত্রের সেই মহাভাবময় সংকীর্তনের কথা। মনে ক'রছিলেন, এই নবদ্বীপেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-তলে আশ্রয় পেয়ে অবস্থান ক'রবেন। আর ফিরে যাবেন না বরাহনগরে। কি হ'বে সেখানে গিয়ে? সেখানে ত' শ্রীগৌরাঙ্গকে এমনতর নিবিড় ভাবে পাবেন না!

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ শুনে তাঁর হৃদয় কি এক অব্যক্ত ব্যথায় নিপীড়িত হ'ল! তিনি কল্পনার চক্ষে দেখ্‌লেন গৌরাঙ্গ-হারা জীবন যেন শূন্যতাময় রুক্ষ মরুভূ তুল্য। তাঁর দু'টি চোখে নেমে এল শ্রাবণ-ধারার মত অজস্র অশ্রুর বন্যা। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর নিদারুণ অবস্থা দেখে অতিশয় কাতর হ'লেন। কিন্তু উপায় নেই—রঘুনাথকে যে যেতেই হ'বে ফিরে। অভয় দিয়ে বল্‌লেন—"আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'বে এই বরাহ-নগরে। দুঃখ ক'রো না রঘুনাথ!"

রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অভয়-বাণী শুনে একটু আশ্বস্থ হ'লেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা ক'রে আমার

আলয়েই আসবেন ! এ যে আমার পরম ভাগ্য ! এমন সৌভাগ্য পৃথিবীর ক'য় জনের হয় ? পিপাসায় স্নিগ্ধ শীতল-বারি পিপাসার্তের কাছে আপনা থেকেই উপস্থিত হ'বে ? এ যে প্রভুর কি অহৈতুকী কৃপা—তা' বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ! তাঁর মত দীনাতিদীন সামান্য নগণ্য ব্যক্তির প্রতি কি অহেতুক ভালবাসা : ওরে মন ! তবে আর ভাবনা কেন ? কিসের সংশয় তোর ? নিজেকে ঢেলে দে তাঁরই অভয় পদারবিন্দে ! তিনিই তোকে ত্রাণ ক'রবেন ! জীবের ত্রাণের জন্যই ত' তিনি এসেছেন মর্ত্যলোকে ! "ভাবিস্ নে মন মিছামিছি, দয়াল যে তোর আছে সাথে !"

রঘুনাথ তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গা-স্নান ক'রলেন। কি পরিতৃপ্তি এই গঙ্গা-স্নানে ! এই পরিতৃপ্তি জীবনে বুঝি তিনি কখনও লাভ করেন নি ! সবই যেন নবদ্বীপের মহিমা—শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা ! তাঁর কণ্ঠ থেকে মন্ত্র উচ্চারিত হ'ল—"সদ্যঃপাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।" তাঁর শরীর মন সব জুড়িয়ে গেল।

রঘুনাথ গদাধরের বাসস্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানেই গদাধরের কাছে "কৃষ্ণ-মন্ত্রে" তাঁর দীক্ষা হ'য়ে গেল। সেই মন্ত্র তাঁর গভীর অন্তরে এক মধুর সম্মোহন জাগিয়ে তুললো ! জীবনের যত দুঃখ বেদনা নিরাশা সব যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথায় তিরোহিত হ'য়ে গেল ! তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন—এই ত' শ্রীগৌরাঙ্গের অপার অহেতুকী করুণা ! গদাধর কিছুক্ষণ রঘুনাথকে ভাগবৎ পাঠ ক'রে শোনালেন। ভাগবতের অমৃত মধুর রস কিছুক্ষিত হ'ল রঘুনাথের তৃষিত-অন্তরে। তিনি সংকল্প ক'রলেন এই ভাগবতকে নিয়েই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কাটিয়ে দেবেন। এই ভাগবৎ হ'বে তাঁর জ্ঞান ও অন্তরের একান্ততম আরাধ্য বস্তু ! প্রভু যে দিন তাঁর আলয়ে এসে উপস্থিত হ'বেন, সেদিন ভাগবতই তিনি তাঁকে শোনাবেন। রঘুনাথ আনন্দে গদগদ হ'য়ে ওঠেন ! আহা, সেদিন কবে হ'বে, সে শুভ-লগ্ন কবে উপস্থিত হ'বে। গদাধর বল্লেন—"আপনার ভাগবত পাঠে বিশেষ অধিকার আছে। আপনি এর ব্যাখ্যানুবাদ করুন। রঘুনাথ গদাধরের সে আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন।

বৈকালেই রঘুনাথ বরাহনগরের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে তাঁকে যেতে হ'বে। সে জন্য তাঁর মনের মধ্যে কোন বিরক্তি বা কষ্টের সঞ্চার হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে দু'টি রূপ ফুটে উঠছে। একটি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলনের রূপ আর তাঁর জন্য বিরহের রূপ। একরূপে আনন্দের বন্যা—যেন কলনাদিনী জাহ্নবীর পবিত্র ধারা—আর একরূপে যেন মন্দগতি কৃষ্ণ-হারা যমুনার আর্তিভরা অশ্রুধারা ! গতরাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর মিলনের চিত্র তাঁকে এখনও উদ্দীপ্ত ক'রছে, আর তাঁকে ছেড়ে যাওয়া—এ যে কি বেদনা ভরা দৃশ্য—তা' তিনি ভুলতে পারছেন না। সব পেয়েও এ যেন হারিয়ে ফেলা ! শেষে তাঁর মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবোদয় হ'ল ! শ্রীগৌরাঙ্গ যা ইচ্ছা ক'রবেন, তা'তো তাঁকে মেনে নিতেই হবে। মনের মধ্যে সেই ভাব জাগিয়ে তুললেন রঘুনাথ ! "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।" তবেই ত' হ'বে সব কিছুর সমাধান। যদি মেনে না নেওয়া যায়—তবে এই জীবনের কি মূল্য থাকে ?

"ইচ্ছা তোমার আমার মাঝে উঠুক জেগে,　　জীবনটারে রেখো না আর ভুলের মাঝে
অই তোমারি সুরের মন্ত্র পরশ লেগে।　　তোমার খেলার বাঁধা-সুরে যেন বাজে।
মোরে তুমি এক ক'রে লও তোমার সাথে,　　দাঁড়াও এসে আমার পথের চলার বেগে,
যুক্ত ক'র তোমার মাঝে দিবস-রাতে।　　তোমার ইচ্ছা আমার মাঝে উঠুক জেগে।

বরাহনগরের তাঁর কুটীরে রঘুনাথ ফিরে এলেন। এসে দেখলেন চারদিকে কত ধুলা-বালি জমেছে। দেখে তাঁর মনে হ'ল, তাঁর আবাস-স্থল কি এক শূন্যতায় ভ'রে আছে। কেউ কোথাও নেই। বাহিরে শূন্যতার দৃশ্য—কিন্তু তাঁর অন্তর-দেশ পরিপূর্ণতায় ভরা। মনে পড়ে তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গের অনুপম মধুময় মূর্তি। মনে পড়ে তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গের

সারা রাত্রি ধ'রে নৃত্য বিলাস। মনে পড়ে তার সেই গগন-ভেদী নাম-কীর্তনের মধুর-ধ্বনি। একি কখনো ভুলে যাবার। এই মধুময়ী স্মৃতিই তাঁর জীবনের এক অমূল্য সম্পদ—জীবন-পথের একমাত্র অবলম্বন এবং পাথেয় স্বরূপ! যতই তিনি স্মরণ করেন—সেই সব দৃশ্য, একটা পরিপূর্ণ আনন্দের বোধ তাঁর অন্তর-দেশ ছাপিয়ে ওঠে। চন্দন-কাষ্ঠকে যতই ঘসা যায়, ততই হয় তার সুগন্ধি-বিস্তার! অপরিষ্কৃত কুটীর ও অঙ্গন তিনি পরিষ্কৃত করলেন এবং দামোদর গোপালকে যথাস্থানে রাখলেন। তারপর তিনি আরম্ভ করলেন দামোদর গোপালের নিত্য সেবা, নিত্য আরাধনা ও নিয়মিত ভাগবত পাঠ। দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটতে লাগলো। সেবা পূজা ও ভাগবত পাঠে তাঁর সারাক্ষণ কেটে যায়। বিরক্তি নেই, শ্রান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই, কোন মনোব্যথা নেই। সর্বদাই বেশ একটা তন্ময়তার ভাব! নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসে তিনি যেন নূতনতর জীবন লাভ করেছেন! তবে মাঝে মাঝে এক একবার তিনি গুমরে কেঁদে ওঠেন—আর ব'লতে থাকেন—"কই, তুমি ত' এলে না। দিন কাটে, মাস কাটে, বৎসর কাটে—কই তুমি ত' এলে না!" তাঁর মনে পড়ে, তিনি যে আপনা থেকেই বলেছেন—"আসবেন। তিনি কি তা' ভুলে গেলেন! কত ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে কত লীলা ক'রছেন তিনি—সে সব কথা হয়ত' মনে প'ড়ছে না তাঁর! নয়ন ছাপিয়ে তাঁর অশ্রু ঝরতে থাকে! সেই প্রবল অশ্রু-ধারা আর বাধা মানে না! তাঁর চোখ মুখ বক্ষদেশ বসন পর্যন্ত সেই অবারিত অশ্রু জলে পরিসিক্ত হ'য়ে যায়! তিনি বিলাপের সুরে কেঁদে কেঁদে বলেন—"কই, তুমি ত' এলে না!" আবার সম্বরণ ভাবে বিভোর হয়ে বলেন—"না-না, তিনি আসবেন! এখনো বুঝি সময় হয়নি! তাঁর আগমন—একি সোজা কথা। দিনে দিনে অন্তর-বেদনায়, বিরহের অনল-দহনে, এ হৃদয় পবিত্র ক'রে আমাকে যোগ্য ক'রে, তবে ত' তিনি আসবেন! তবে তাই হোক! বেদনায়, বিরহে, শত জ্বালায় দগ্ধ ক'রে—তুমি যে আসবে!"

"এই ক'রেছ ভালো নিঠুর, এই ক'রেছ ভালো!
এবার আমার বুকের মাঝে তীব্র দাহন জ্বালো!
আমার এ্রূপে না পোড়ালে, গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে, দেয় না কিছু আলো।
এই ক'রেছ ভালো নিঠুর, এই ক'রেছ ভালো।

শ্রীগৌরাঙ্গ-আসবেন একদিন তাঁর কুটীরে। কোন্ ক্ষণে, কোন্ শুভ-লগ্নে কিছুই জানা নেই। তবু প্রতীক্ষা ক'রতে হ'বে—অধৈর্য হ'লে চলবে না—মনকে বোঝাতে থাকেন রঘুনাথ। শরীর জীর্ণ হয়ে আসে, শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসে। যতই দিন চ'লে যায়, তিনি ততই ধৈর্যশক্তি দিয়ে ব্যথা-কাতর বুকখানিকে বাঁধতে চেষ্টা করেন। কোথাও একটু শব্দ হ'লেই ছুটে যান তাড়াতাড়ি—এই বুঝি তিনি এলেন! চারিদিক খুঁজে বেড়ান—খুঁজে খুঁজে হায়রান—কোথায় তিনি। চারিদিক যেন শূন্য মনে হয়, ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি। মনে পড়ে যায়— গদাধর পণ্ডিত যে তাঁকে ভাগবতের অনুবাদ ক'রতে বলেছেন! কিছুই ত' করা হয় নি! ভাগবতের পুঁথি বাহির ক'রে, লেখনী দিয়ে তখনি লিখতে আরম্ভ ক'রলেন। দিবা-রাত্রি কঠোর পরিশ্রম ক'রে শেষ করলেন অনুবাদ-গ্রন্থ। নাম দিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী।"

* * * * *

এদিকে নবদ্বীপের দৃশ্যের পট পরিবর্তন হ'য়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে, তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ-বর্গ নিয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে যে দিব্য-রূপে ফুটে উঠেছিল, সবই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। নবদ্বীপের পথে ঘাটে এবং ভক্ত-সমাজে মুহুর্মুহু যে নাম-কীর্তনের উচ্চ-রোল শোনা যেত, সব স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছে! তার স্থানে পরিলক্ষিত হচ্ছে—নবদ্বীপের আকাশ বাতাস ভ'রে সকলের করুণ আর্তনাদ। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীমাতা পাগলিনী আর বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিতা! কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন—কাকেও কিছু না ব'লে মাঘ মাসের এক গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। সারা নবদ্বীপ হ'য়ে উঠেছে কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবনের মত!

"তরু-লতা যত আছে শত শত পত্র-পুষ্পে ভরা, প্রখর-রবির প্রখর-কিরণে মেঘ নাহি সঞ্চারে,
সব শুকে গেছে বিরূপ করেছে যেন চৈতালী ঝরা ! শাখে বসি' পাখী মুদি' দুই আঁখি গাহিবারে নাহি পারে ।
শান্তির ছায়া নাহিক কোথাও, আছে ধেনু যত নদীরার মাঝে,
সুখ-আশা সব হয়েছে উধাও, হাম্বা হাম্বা সুরে নাহি ডাকে
সবার জীবন মরুভূমি সম, অকালে ছেয়েছে জরা ! সারাটি নদীয়া গৌরার লাগিয়া কাঁদিছে অশ্রু ধারে !"

সারা নবদ্বীপের অধিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ হারা হ'য়ে কেবলি কাঁদছে— !

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। মুণ্ডিত মস্তক আর কৌপীনবন্ত হ'য়ে তাঁর বেশ-বাস সব পরিবর্ত্তন ক'রেছেন ! আর তিনি গৃহে ফিরে যাবেন না ; গৃহের মায়া, নবদ্বীপের মায়া সব কাটিয়ে চলেছেন উন্মাদের মত শ্রীবৃন্দাবনের পথে ! আর মুখে অবিরাম "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি তুলছেন ! নবদ্বীপের এই করুণ-কাতর দশা দেখে নিত্যানন্দও কেঁদে উঠলেন। তিনি স্থির ক'রলেন—শ্রীগৌরাঙ্গকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনবেন, নবদ্বীপের শত চন্দ্রের হাট ভাঙতে দেবেন না ! শেষে পথি-মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। কত কাকুতি মিনতি জানালেন তাঁর কাছে। প্রভু তখন নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে শান্তিপুরে ফিরে এলেন। সে সংবাদ শুনে নবদ্বীপের অধিবাসীরা আর শচীমাতা সেইখানে উপস্থিত হলেন। সকলে যেন তাঁদের হারানিধিকে আবার ফিরে পেলেন ! কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল। তারপর মায়ের আদেশ পেয়ে শ্রীধাম পুরীতে উপস্থিত হলেন। তিনি দুই বৎসর ধরে দক্ষিণ দিকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। সর্বত্রই নাম প্রচার করতে লাগলেন—সর্বত্রই নাম-কীর্ত্তনের জোয়ার বইতে লাগলো। এবার তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাবেন। যাত্রা পথের মধ্যে বহুস্থান পর্যটন ক'রে তিনি উপস্থিত হলেন পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আবার চ'লে গেলেন মালদহ, কালনা, কুমার হট্ট প্রভৃতি স্থানে। আবার ফিরে এলেন রাঘব পণ্ডিতের কাছে। তারপর চৈত্রমাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে নৌকাযোগে এলেন খড়দহনগরে। ঘাটে তাঁর তরী লাগলো। গ্রামের পথ ধ'রে চললেন তিনি কিছুক্ষণ। হঠাৎ তাঁর কর্ণে ভেসে এল যেন কার সুমধুর কণ্ঠে ভাগবৎ পাঠের ধ্বনি ! সেই ধ্বনি লক্ষ্য ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গ ছুটলেন বাহ্য-জ্ঞান-হারা উন্মাদের মত ! তিনি উপস্থিত হলেন রঘুনাথের কুটীরে, রঘুনাথ তখন ভাগবত পাঠে নিবিড় ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন ক'রে তিনি বিস্মিত ও অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। একবার তাঁর মনে উদিত হ'ল—যা দেখছেন তিনি, এ স্বপ্ন না সত্য ! শেষে তাঁর ধারণা হ'ল—এ সত্য—স্বপ্ন কখনও হ'তে পারে না ! কারণ তিনি ত' সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত, তিনি ত' নিদ্রিত ন'ন। দীর্ঘদিন অপেক্ষা ক'রে, অনেক বিরহ-বেদনা সহ্য ক'রে আজ নিতান্ত নিকট হ'তে নিকটতররূপে তিনি তাঁকে পেয়েছেন ! কি পরম সৌভাগ্য তাঁর আজ তিনি নিজে এসেছেন, তাঁর সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ ক'রবার জন্য ! তিনি লক্ষ্য ক'রলেন—শ্রীবাস-অঙ্গনে তাঁর যে রূপ দেখেছিলেন সবই পরিবর্তিত। মস্তকখানি মুণ্ডিত আর পরিধানে ডোর-কৌপীন ! শ্রীমুখের লাবণ্য-দ্যুতি দেখে, করুণার মধুহাসা দেখে, তিনি তাঁকে পরম আপন-রূপে চিনতে পারলেন ! তিনি তাঁর আসন থেকে ওঠবার উপক্রম ক'রলেন দু'টি রাতুল-চরণে নিপতিত হ'বার জন্য ! কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হ'ল না। প্রভু তাঁর সেই চেষ্টাকে নিষ্ফল ক'রে "বোল্ বোল্" এই ধ্বনি তুলতে লাগলেন। আবার তিনি ভাগবত-পাঠে মনোনিবেশ ক'রলেন। রঘুনাথ সুললিত-কণ্ঠে ও ভাব-বিভোর-কণ্ঠে পাঠ করছেন গোপী-গীতার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর কাহিনী। রঘুনাথের সুললিত-কণ্ঠে ভাগবতের সেই শ্লোকগুলি শুনতে শুনতে শ্রীগৌরাঙ্গের সারা হৃদয়, দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি নেচে উঠতে লাগলো। তাঁর সেই দিব্য-নর্তন আর থামে না। শ্রাবণের সমাগমে কালো মেঘ দেখলে ময়ূর যেমন অধীর আনন্দে নৃত্য করে, শ্রীগৌরাঙ্গও আজ তেমনি ভাগবতের শ্লোকগুলি শুনতে শুনতে আনন্দে আপন-হারা হ'য়ে নৃত্য ক'রছেন। রঘুনাথও শ্রীগৌরাঙ্গের সেই নিবিড় ভাব-রসে ভরা নৃত্য-ভঙ্গিমা

দেখে উদ্দীপিত হচ্ছেন। রঘুনাথ ভাগবত-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব ক'রছেন, ভাগবত যেন আজ সচল বিগ্রহ রূপ ধারণ ক'রে তাঁর সম্মুখে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন! রঘুনাথের ভাগবত-পাঠের বিরাম নেই, শ্রীগৌরাঙ্গের সেইরূপ নৃত্য-ভঙ্গিমারও বিরাম নেই। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হ'ল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতিস্থ হ'লেন। ত্বরিত-চরণে শ্রীগৌরাঙ্গ ছুটে গেলেন রঘুনাথের কাছে! নিমেষের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য সূচিত হ'ল; শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুনাথকে গভীর ভাবাবেশে আপন বক্ষে ধারণ ক'রলেন! রঘুনাথের বক্ষখানি তাঁর দিব্য-অঙ্গ-স্পর্শে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। তাঁর চির-দিবসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ যেন হৃদয়ের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো! তাঁর মনে হ'ল—এত সুখ, এত পরিতৃপ্তি, এত আনন্দ জীবনে কোনদিন ক্ষণেকের তরেও লাভ ক'রতে পারেন নি! আজ কি এক পরম সৌভাগ্যবশে মহাপ্রভুর অপার করুণায় তাই তিনি লাভ ক'রলেন।

গৌরাঙ্গ প্রীতিভরাকণ্ঠে রঘুনাথকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন—"আচার্য, তুমি আজ আমাকে এক অপূর্ব আনন্দ দান ক'রলে। এ আনন্দের সীমা নেই, পরিসীমা নেই! শ্রীমদ্ ভাগবত-পাঠ অনেক শুনেছি—বহু ভক্তের কণ্ঠে। কিন্তু এত সুখ, এত আনন্দ কোনদিন পাইনি! তোমার ভাগবত-পাঠে আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। আজ থেকে তোমার নাম রইলো—ভাগবতাচার্য। আমার ইচ্ছা, এই রকম ভাগবত পাঠ ক'রেই তোমার জীবন অতিবাহিত কর। এই ভাগবত-পাঠের মধ্যেই তুমি আমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করবে।"

লোকমুখে প্রবাদ আছে, মহাপ্রভু রঘুনাথের ভাগবত-পাঠে আকৃষ্ট হ'য়ে এখানে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পদরজ বক্ষে ধারণ ক'রে এ বরাহনগর ধন্য হ'ল। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদ-পূত এই বরানগর।

এর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলের পথে অগ্রসর হলেন, রঘুনাথও তাঁর অনুগমন ক'রলেন। রঘুনাথকে সঙ্গে আসতে দেখে তিনি বল্লেন—"এ কী? তুমি কোথায় চ'ল্লে?"

রঘুনাথ বল্লেন—"আমি আপনার সঙ্গে যাব। আপনার সঙ্গলাভই আমার জীবনের পরম কাম্য? শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লেন—"না, না, তুমি গৃহে ফিরে যাও—শ্রীমদ্ ভাগবতের সেবায় অনুরক্ত হও।" প্রভুর কথা শুনে রঘুনাথের হৃদয়ে বিরহের আগুন জ্বলে উঠলো। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর মনের ব্যথা অনুভব করলেন। তিনি তাঁর শ্রীচরণ থেকে পাদুকা যুগল খুলে রঘুনাথের হস্তে প্রদান ক'রলেন আর বল্লেন—এই নিয়ে তুমি গৃহে ফিরে যাও। তোমার হৃদয়ের শত বিরহের জ্বালা এই পাদুকার দ্বারাই দূরীভূত হ'য়ে যাবে। এই কথা ব'লেই মহাপ্রভু প্রস্থান করলেন। রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত পরম পবিত্র পাদুকা যুগল মস্তকে ধারণ ক'রলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের স্পর্শমাখা পাদুকা তাঁর বিরহ-কাতর হৃদয় জুড়িয়ে দিল। সারা দেহ-মন আনন্দে শিহরিত হ'য়ে উঠলো। তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন সেই পাদুকা-যুগল বেদীর উপরে। নিয়মিত ভাবে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো—পাদুকা-যুগলের সেবা, শ্রীদামোদরের সেবা আর ভাগবতের পাঠ। এই সব নিয়েই তাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। কবে ভাগবতাচার্যের নর-জীবন শেষ হয়েছিল, তার কোন নিদর্শন আজো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে শোনা যায়, তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর দেহ এবং যা কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল তাঁর কুটীরের অঙ্গনে সমাহিত করা হয়েছিল।

ভাগবতাচার্যের এই পবিত্র কাহিনী প্রায় পাঁচশত বর্ষের পূর্বের ঘটনা। বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। কালের কুটিল কটাক্ষে ভাগবতাচার্যের সমস্ত নিদর্শন অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক যুগে এক দৈব-স্বপ্নাদেশে খনন কার্য করার ফলে সেই পুরাতন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাগবতাচার্যের শ্রীমদ্ ভাগবত, একটি গোপাল বিগ্রহ, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদুকা-যুগল, শালগ্রাম নারায়ণ এবং ভাগবতাচার্য-লিখিত "কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী"—সমস্তই অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পরে অনেক ভক্ত বহুদিন ধ'রে ঐ সমস্ত দ্রব্যের সেবা-পূজা প্রভৃতির ভার গ্রহণ করেন। পরিশেষে নামাচার্য শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী নূতন ক'রে সমস্ত ভার নিয়ে ঐ স্থানটিতে

বিরাট প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন। এর একন নাম হয়েছে পাঠবাড়ী। প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর আগমন দিনটি স্মরণ ক'রে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বিশেষ উৎসব পালন করা হয়। ঐ দিনটিতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ঐ স্থানটিতে মন্দিরে মন্দিরে পূজো ও নামকীর্তনাদি হ'য়ে থাকে। ঐ পাটবাড়ীকে কেন্দ্র ক'রে বরাহনগর একটি মহাতীর্থ রূপে পরিণত হ'য়েছে।

"অতীত দিনের তিমির মাঝে
　　কতই কি যে পড়ে ঢাকা,
সময় হ'লে বেরিয়ে আসে—
　　হৃদয়ে তা রহে আঁকা।
চিরন্তনের রূপটি ল'য়ে,
　　আসে সে যে নূতন হ'য়ে,
আলোক তাহার আপনি ফুটে—
　　দিব্য-উজল-দ্যুতি-মাখা।"

—:০:—

হে আষাঢ় তোমায়

শ্রীশরণাপুরী

হে আষাঢ় তোমায়—দেখবো বলে—
　　আমি প্রতীক্ষা করি প্রতিদিন,
বাধা কৃষ্ণ দ্বারা হয়ে যেতে পারে
কখন তুমি আসবে—
আর তোমার হঠাৎ আসার স্পর্শে
চকিত হয়ে মধুমালতীরা
পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে
　　কেমন করে
মিষ্টি মধু হাসবে।

শুনবো বলে—
　　আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকি প্রতিদিন
কথায় কথায় যাদের চোখে জল আসে
　　তাদের কানে
চুপে চুপে যত কথা তুমি বলবে
সুখে দুখে গাঁথা
　　মল্লারে সাধা তোমার বীণায়
ক্ষণে ক্ষণে যত গান তুমি গাইবে—

আমি প্রতীক্ষা করি প্রতিদিন
কিছু প্রশ্ন তোমায় করব বলে—
তুমি কি আদি কবি বাল্মিকীর
রামগিরি পর্বত থেকে নামছ ?
তুমি কি কবি কালিদাসের
সিপ্রা তীরবর্তী রূপময়ী উজ্জয়িনী থেকে আসছ ?
বিরহিনীদের উত্তাপে গলে গলে—
　　অথবা
শ্যাম মিলনের নীলপাত্রখানি
যুগযুগান্ত ধরে
　　রেখে যেতে এই ধরণী পরে।

—:০:—

যুগসূর্য বিবেকানন্দ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মূর্ছা কিম্বা মোহনিদ্রা কিম্বা তীব্র বিষে বিষাইয়া
জীবন্মৃত ছিল দেশ হীনমন্য দাসত্বে মজিয়া
ইংরাজের পদধূলি শিরে তুলি করিত লেপন
প্রসাদে ধন্য করি, পরাধীন রাজভক্তগণ।

হুঙ্কোলে চলে বীর জাগৃতির মন্ত্রদাতা গুরু
স্বাধীনতা—সাধনার করিলে উদ্যোগপর্ব সুরু
পৌরুষে পুরুষসিংহ বিবেকে বিচার নিষ্ঠ সদা
ভারতের সর্বদুঃখে ভারাতুর হৃদয় সর্বদা।

কায়মনোবাক্যে যা'র পরাধীনতায় আত্মগ্লানি
দিবসে না দিত শান্তি নিশীথে করিত নিদ্রাহানি।
গুরু যা'র রামকৃষ্ণ, সর্বধর্ম-সমন্বয়-ঋষি—
বক্ষতলে সিংহাসন ব্রহ্মবিদ্যা তাহার মহিষী।

চিকাগোর ধর্মসভা সম্বোধিল সে-ভিক্ষু নবীন
গথা হ'ল সে-সভায় বাগ্মিতায় সমকক্ষহীন।
সর্বজীবে শিবজ্ঞান শিব যা'র জীবকল্যাণী
আদর্শ আকাশস্পর্শী হিমাদ্রিরে হয় লজ্জাদায়ী।

দেশভক্তি দীক্ষাদানে সে হইল মুক্তিমন্ত্রদাতা
সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ—নিবেদিতা সাধ্বী লোকমাতা।
নেতাজীরও নেতা তিনি,—গান্ধী অরবিন্দ ভক্ত তাঁর,—
দেশের শহীদবৃন্দ সানন্দে বন্দিল পদ তাঁর।

মাটির পুতলী ছিল নরনারী নিষ্প্রাণ নিসাড়
প্রাণাগ্নি আনিয়া নিজে প্রাণ শক্তি করিলে সঞ্চার
প্রমিথিউসের মত,—নিজে চাহে ভুঞ্জিতে নিরয়,—
ভাগ্যহত নারায়ণ যদি তাহে কিছু সুখে রয়।

অগ্নিগর্ভ বাণী শুনি' জাগে আসমুদ্র-হিমাচল
চক্ষে জ্বলে জ্ঞানালোক, বক্ষে তার জ্বলে হোমানল।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মূর্খ পণ্ডিতের গণ্ডীভেদ নাশি
আবালবনিতা বৃদ্ধে বলে 'ওঠো জাগো দেশবাসী'।

আজিও ধ্বনিত হয় সে গম্ভীর মেঘমন্দ্র স্বর
সর্বজীবে এক আত্মা পরমাত্মা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।
প্রভায় ও প্রতিভায় কেহ নাই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর
পূর্বপশ্চিম প্রতীচ্য প্রাচ্য নীরাজনা করে বারবার।

অতীতের অহঙ্কারে পতিতেরা অঙ্গে উপহাস
প্রাচীনেরা 'আর্য' ছিল অর্বাচীন আজি সবে 'দাস'।
মান্ধাতা-গৌরব স্মরি ষণ্ডবৎ রোমন্থনে রত!
দোর্দণ্ড প্রতাপ কোথা? মেরুদণ্ড কোদণ্ডের মত!

সে-আলেখ্য গেছে মুছে, মিছে তর্কবিতর্ক জল্পনা
সে গর্জিল জাগো ভাই বিশ্বসহ পাতাও মিত্রতা।
এই দেশ স্বর্গ মোর, স্বর্গ মোর এ স্বর্গের ধূলি
বীর্যবলে বাঁধি বুক অগ্রে চল কোটি শির তুলি।

এ-সমাজ শিশুঘ্নিয়া যৌবনে সাধের উপবন শশী
বার্ধক্যের বারাণসী অহর্নিশি সাধনার ধন।
গৌরীনাথ জগদম্বে! এ লাঞ্ছিত নিগৃহীতদের
শক্তি দাও, মুক্তি দাও, দূর কর ক্লৈব্য ভারতের।

মানুষে মানুষ কর, নারী হোক আদর্শ-জননী
সিংহের বিক্রম লভি হোক তারা বীরশিরোমণি।
আগামী পাঞ্চাশ বর্ষে ভুলে যাও অন্য দেবী-দেবা
মাতৃপাদপীঠ স্পর্শি' মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষা লবে যেবা।

সে জীবন্ত প্রার্থনায় জীবন্মৃত লভিল জীবন
পঞ্চাশৎ বর্ষে ঠিক কাটিল সে দাসত্ব বন্ধন।
সত্য করি' তাঁর বাক্য আঠারশো সত্তনব্বতির
ঠিক পঞ্চাশৎ বর্ষে ইতিহাস স্বাধীন মুক্তির।

জীব-শিব সেবামন্ত্রে উঠিল উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠান
রামকৃষ্ণ-সারদার সারোদার মহিমার গান।
সন্ন্যাসী সন্তান দল সঞ্চয় সদা স্নেহশীল
বৈরাগ্যের রক্তে রাঙা-অনুরাগে রাঙালো নিখিল।

স্বাধীন ভারতবর্ষে তাঁর দিব্য আবির্ভাব স্মরি
শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে গর্বে হর্ষে সহস্র নতি করি। ১৮

—১০১—

অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উড্‌রফের দীক্ষা

শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৯৮০ সাল, ২২শে সেপ্টেম্বর অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিখ্যাত বডেলীন লাইব্রেরীতে গ্রন্থ সংগ্রহ দেখছিলাম। গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞাসা করলাম "এলিসিয়াম গ্রামটি কতদূরে ?" গ্রন্থাগারিক বল্লেন—"অকস্‌ফোর্ড সহর হতে ৪৫ মাইল নর্থ-ইষ্ট—উত্তরপূর্বে।" আমরা তৎক্ষণাৎ মোটরে বাহির হ'য়ে পড়লাম এলিসিয়াম গ্রামের উদ্দেশে ; উড্‌রফ ভবনে যখন আমরা পহুঁছিলাম তখন ইংলণ্ডের বিকাল, বেলা ৩টা। সেদিন প্রখর সূর্যতাপ। উড্‌রফ ভবনের চারিদিক বড় বড় ওক্ ও অন্যান্য গাছে ঘেরা, ছায়া-সুশীতল পরিবেশ। বাড়ীর গেট হ'তে পোর্টিকো পর্য্যন্ত কাঁকর ঢালা মোটর চলা পথ। আমরা গেটের কাছে মোটর রাখতেই গৈরিকভূষিতা ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা শোভিতা, নগ্ন পদা একজন ঈষৎ ঘর্ষিরসী অতি সৌম্যদর্শনা মহিলা গেট পর্য্যন্ত এসে গেট খুলে আমাদের ভিতরে আসতে আমন্ত্রণ করলেন।

যথাস্থানে মোটরটি রেখে আমরা মহিলাটির সঙ্গে এসে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লাম। বেশ বড় দোতালা বাড়ী, একতলায় বেশ বড় বড় চারিখানি ঘর ও তৎ সংলগ্ন একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর ও সেইটিই দেবী-মন্দির। ভারতীয় সপ্তদশীর্ষ অনুকরণে ওক্ কাঠে খোদাই করা সিংহাসন ও সেই সিংহাসনে স্বর্ণময়ী সিংহবাহিনী মূর্তি, প্রায় ৭ ইঞ্চি (সাত ইঞ্চি) উচ্চতায়, ৺মায়ের গায়ে কোন বস্ত্র নাই। মূর্তির বাঁ পাশে গুরু শিবচন্দ্রের যোগাসনে উপবিষ্ট সিপিয়া রং-এর বেশ বড় একটি ছবি বসান আছে। বেদীর উপরে পূজোপকরণ, নানারকমের ফুল ও বৈকালিক নৈবেদ্য সাজান। মহিলাটি অত্যন্ত মৃদুভাষী, ব্রহ্মচারিণী ও ৺মায়ের নিত্য সেবিকা। তিনি উড্‌রফের একমাত্র মৃত ইঞ্জিনিয়ার ছেলের একমাত্র কন্যা, ও মাতৃহারা। তিনি অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রে এম. এ.। তাঁহার ঠাকুরদাদা উড্‌রফ নাতনীকে ৺মায়ের পূজোদি বিষয়ে শিক্ষা দেন ও ঐ সেবিকাকে তন্ত্রে মন্ত্রযোগে দীক্ষা দেন ও সংস্কৃতজ্ঞ করেন। কথায় কথায় মহিলাটি নাম জান্‌তে চাইলে বল্লেন, "Mary Elizabeth উড্‌রফ্—মেরী, উড্‌রফের মায়ের নামের আদ্যাংশ, Elizabeth উড্‌রফের স্ত্রীর নামের আদ্যাংশ, ও উড্‌রফ, বংশের নাম। মা মেরী ৺মায়ের বৈকালিক পূজো সেরে আমাদের বৈকালিক প্রসাদ, নানা ফল, পায়েস ও ছানা খাওয়ালেন। বিলেতে ফিরে গিয়ে ১৯২৬ হ'তে ১৯৩৬ সাল দেহান্তকাল পর্য্যন্ত, উড্‌রফ ঐ মন্দিরে ইষ্টদেবীর আরাধনা ক'রতেন।

মন্দিরে সবুজ বাল্‌বের আলো সর্বক্ষণ জ্বলে ও ভারতীয় ধূপকাঠি, (বাঙ্গালোর হ'তে আনা) সব সময়ই পুড়ে। সমস্ত মন্দিরটি একটি দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি ক'রেছে। বাড়ীর কোন ঘরে কোন অভারতীয় একখানি ছবিও নাই। নিচের ও ওপরের আটটি বড় বড় ঘরের চার দেওয়ালে ভারতীয় ও তিব্বতীয় তন্ত্র শাস্ত্রাশ্রিত হাতে আঁকা পট সুসজ্জিত। দেবদেবীর মূর্তিগুলি তন্ত্রশাস্ত্র নির্দেশিত শৈলীতে পটে আঁকা। প্রতিটি ঘরের চার দেওয়াল ঘিরে পটের সারির নীচ দিয়ে ওক্ কাঠের সেল্‌ফ। প্রতিটি সেল্‌ফে ভারতীয় ও তিব্বতীয় তন্ত্র শাস্ত্রাশ্রিত নানা দেবদেবীর, পাথরের, পিতলের ও ব্রোঞ্জের নানা ছাঁদের মূর্তি সম্ভার, প্রত্যেক মূর্তির পাশে পরিচিতি জ্ঞাপক সংকেত, ইংরাজিতে লেখা কার্ডে পাওয়া যায়। প্রতিটি ঘরই চিত্র, ভাস্কর্য ও ধর্মগ্রন্থ দ্বারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত। কোন আইন সংক্রান্ত বই নাই। সব বই ঘর ভারতীয় ও তিব্বতীয় বা ফরাসী, বা ইংরাজি বা জার্মান বা বাংলাভাষায় লেখা তন্ত্র, বেদান্ত, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ ও ভারতীয় চিত্রকলা ও সঙ্গীত বিষয়ে। কিছু হাতে লেখা সংস্কৃত ও তিব্বতীয় তন্ত্র গ্রন্থও দেখলাম।

সেগুলি তালপাতা বা তুলট্ কাগজ বা তিব্বতীয় সিল্ক কাপড়ের উপর বিভিন্ন শৈলীতে লেখা। দোতালার উড্রফের পড়ার ঘরে একটি সেল্‌ফে গুরু শিবচন্দ্রের উড্রফকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রায় দুইশত চিঠি সংরক্ষিত দেখলাম। উড্রফ তন্ত্র, বেদ ও বেদান্ত বিষয়ে কোন কূট তত্ত্ব গুরু শিবচন্দ্রের কাছ হ'তে ভালভাবে জেনে নেবার জন্য গুরুকে সংস্কৃত ভাষায় চিঠি লিখতেন, ভারতে ও বিলাতে থাকাকালীন। গুরু শিবচন্দ্র ঐসব চিঠির উত্তর দিতেন উড্রফকে সংস্কৃত ভাষায় চিঠি লিখে। গুরুকে লেখা উড্রফের চিঠি বহু অনুসন্ধান করে খুঁজে পাইনি। উড্রফকে লেখা গুরু শিবচন্দ্রের চিঠিগুলি ধর্মশাস্ত্র তথা তন্ত্র ও বেদান্ত বিষয়ে একটি অমূল্য সম্পদ। গুরু শিবচন্দ্র শিষ্য উড্রফকে দেখা হ'লে মুখে ও দূরে থাকলে চিঠিতে "শাম্ভবী-দীক্ষা" ক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। শাম্ভবী দীক্ষাদাতা গুরু শিবচন্দ্র শিষ্য উড্রফের ধর্মশাস্ত্র তথা তন্ত্র বেদান্তাদি বিষয়ে গবেষণার প্রধান পরিচালক ও নির্দেশক ছিলেন। উড্রফভবনের সামগ্রিক পরিবেশ ও সংস্থান দেখে মনে হ'ল যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ না করেই খ্রীষ্টান উড্রফ হয়ে গিয়েছিলেন তন্ত্রাশ্রিত সার্বভৌমিক ধর্মপালন করে কোলঞ্জ গৃহাবধূতে ও যোগসিদ্ধ সাধু তন্ত্র বেদগামী। বেদে হিন্দুধর্ম বলে কোন কথা পাওয়া যায় না। যে কোন ধর্মের, বা বর্ণের বা জাতীর স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে তন্ত্রাচার পালন করবার শাস্ত্রসম্মত অধিকার আছে। "তন্ত্রাচার" উড্রফ বলেন "আর্যধর্ম অনুস্যূত ও আর্যধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম"। [Woodroffe —Is India civilised ? পুস্তক দ্রষ্টব্য] উড্রফভবনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে বৌদ্ধ মহামানী হিন্দু না হয়েও তন্ত্রচার করতে পারে ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী—হিন্দু না হয়ে তন্ত্রাচার ক'রতে পারে। ধর্মসাধনা, যে কোন ধর্মই হোক না কেন, উড্রফের মতে "a psycho-physical process to be adopted by man"—উড্রফ বলছেন যে ধর্মসাধনা যে কোন ধর্মই হোক না কেন, দৈহিক ও আত্মিক প্রক্রিয়া নির্ভর।

তিনি ধর্মনিরপেক্ষ সাধনার একটি গূঢ় তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন—"সঠিক অধ্যাত্ম জ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনা বিশেষভাবে নির্ভর করে সাধকের কুলকুণ্ডলিনীর ক্রিয়া সাপেক্ষে। কুণ্ডলিনী শক্তি সাধকের life force প্রাণশক্তি যাহার পূর্ণ জাগরণ দেহাধারে সম্ভব, সাধন সৌকর্যে। দেহাধারে সুপ্তা কুণ্ডলিনীর বিশ্রাম অবস্থা। কুণ্ডলিনী বা life force (প্রাণশক্তি) বা চিৎ শক্তি অথবা চৈতন্য শক্তি সংসার পরিবেশে জাগ্রত হ'তে পারে কারণ সংসার ক্ষেত্রেই মহাবিশ্ব কুণ্ডলিনীর বহিঃপ্রকাশ। যখন দেহাধারে জাগ্রত ঐ শক্তি, সাধকের আত্মস্থ নিত্য শুদ্ধ পরাশক্তির পরিবেশের সঙ্গে যোগযুক্ত হ'তে পারে সাধন ক্রিয়া কৌশলের সৌকর্যে, তখন সাধক হয় যোগসিদ্ধ—ও সংসার পরিবেশের মধ্যে থেকেও যোগসিদ্ধ সাধক যেন ঘুমে ঘোরে হয় সংসার বোধবিহীন। ঐ অবস্থায় যোগসিদ্ধ সাধক, সে যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, "সংসারে বাস করেও নিরন্তর পরাশক্তির পরিবেশের মধ্যে উপলব্ধি করে আনন্দ প্রবাহের ফল্গু-ধারা। ইহাই সার্বভৌমিক ধর্মসাধনার ঈপ্সিত লক্ষ্য।"[৩৫]

উড্রফের দেবালয়ে বসে মনে হ'তে লাগল যে উড্রফ গুরুকৃপা ও স্বীয় সাধন সৌকর্যে হয়েছিলেন "একানন্দ চিদকৃত"। ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা ক'রে উড্রফ বলছেন—"এক=মুখ্য, আনন্দ=সুখ, চিৎ=বোধি চৈতন্য বা প্রকাশজ্ঞান, অকৃত=স্বরূপ। ইহাই শাস্ত্রাদ্বৈত বাদের চরম কথা। আজীবন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কার ও পরিবেশ পুষ্ট Sir Johen George Woodroffe M.A. Bar at Law D.C.L, L.L D Chief Justice-এর নবজন্ম হ'ল ভারত ভূমিতে গুরু শিবচন্দ্রের আশ্রয়ে, ও তিনি হলেন দিব্যাচারী কৌলজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ তন্ত্র যোগসিদ্ধ গৃহাবধূতে। দীক্ষার অলৌকিক রহস্যাবরণ উড্রফ নিজ জীবনেই উন্মোচন ক'রলেন গুরুকৃপা কারণে।

(ক্রমশঃ)

৩৫। উড্রফ—Serpent Power—ভুজঙ্গিনী শক্তি ২০ (১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। প্রাসঙ্গিক অংশের বাংলা অনুবাদ।

শ্রীশ্রীকপিলেশ্বর মাহাত্ম্য

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান ভূমিতত্ত্ব :

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভাগিরথীর তীরে শক্তিপুর গ্রামে এই শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে লিখিত (শিব নাম স্তোত্রে কপালেশ্বর আখ্যানে) মহালিঙ্গ শ্রীশ্রীকপিলেশ্বর মহাদেব বিগত কোন ৬ঠা ভাদ্র, রাত্রি পেড় ঘটিকায় মন্দিরসহ ভাগিরথী গর্ভে নিমগ্ন হন। পরে স্থানীয় লোকেরা গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে তালপত্রের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মহালিঙ্গ কোন্ কাল হইতে এই স্থানে অবস্থিত তাহা সকলের অজ্ঞাত। তাহার কৃপা প্রভাবে এইস্থান মহাপুণ্য স্থান। "দেশোঽহি পোষঃ তথাতি। পুণ্যা ফলদঃ শম্ভু স্বয়ম্ভূর্যত্র" ইতি পুণ্ডরীক্ কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা।

এইজন্য উক্ত ৬ঠা ভাদ্র প্রতিপলে একটি একান্ত দুর্ঘটনা পূর্ণ দিবস রূপে গণ্য হইয়াছে। ইনি যে মহামুনি কপিল আরাধিত তাহার প্রমাণ বহু উপাখ্যান পূর্ণ ঘটনার বিবরণে পাওয়া যায়। চন্দ্রচূর মাহাত্ম্য নামক প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে কপিলেশ্বর কলেশ্বর তত্ত্বে উল্লেখ আছে কপিল মুনি কর্তৃক আরাধিত বলিয়া ইনি কপিলেশ্বর কপিলনাথ, এই দুই নামে পরিচিত। পরে কোন সময়ে কোন কাপালিকের দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়া কপালেশ্বর ও কপালেশ নাম প্রাপ্ত হন। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে কপালেশ্বর নামের উল্লেখ আছে। যথা—ভাগিরথী নদী তীরে কপালেশ্বর ঈরিত।

এই স্থানেই মহামুনি কপিলের অভিসম্পাতে ভস্মীভূত সগর সন্তানগণ গঙ্গাদেবীর পবিত্র বারি স্পর্শে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতি—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণাক্তর্গত মধ্য খণ্ড দ্বাবিংশ অধ্যায়। এই ভূমি লক্ষ্য করিয়াই সগর বংশের উদ্ধারের নিমিত্ত পুণ্যসলিলা মা গঙ্গার মর্ত্যে আগমন হয়। ভগীরথের তপস্যার ফলে আগমন বলিয়া ভাগিরথী নামে খ্যাতা। এই ভূমি কিরীটিনী পীঠের অন্তর্ভূক্ত। কিরীটিশ্বরী, কিরীটবলা বা কিরীটিনী এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই পীঠ কপিলেশ্বর সান্নিধ্যে বিদ্যমান।

বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজারা এই মহাদেবের সেবাইত ছিলেন। নুলোপন্যাসনের কায়স্থ কারিকা গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সূরে বংশীয় রাজা আদিত্যসূরে এই স্থান হইতে কণ্টকনগর বা কাটোয়া পর্য্যন্ত বহু সম্পত্তি বাবা কপিলেশ্বর দেবের সেবা পূজার জন্য দান করিয়াছিলেন উহা বঙ্গীয় ৩৯৩ অব্দে ঘটিয়াছিল। ইহার ঘোষণাপত্র যথা—"বাজার শক্তিপুরে ভিহি গঙ্গা ধারে, কপিলেশ্বরদেব আছেন তথারে, তৎপর ভিহি কণ্টকনগর, ইতিমধ্যে দেবভূমির না লইব কর।" ইতি—নুলোপন্যাসনের কায়স্থকারিকা।

ইহা মহাতীর্থ স্থান। এই তীর্থের অধিকর্ত্তা শ্রীশ্রীকপিলেশ্বরদেব। এই তীর্থে বহু অতীতে মহামুনি কপিলাদি অনেক মহাপুরুষ তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন ভাগিরথীর কণ্টকাকীর্ণ তীরে ভগ্ন মন্দিরে বাবা কপিলেশ্বর অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানে রাজা রামজীবনকে কপিলমুনি একজন বর্ম্মকার ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়া প্রচ্ছন্ন কপিলেশ্বরকে দর্শন করাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং রাজাকে নিজের পরিচয় এবং এই স্থানের পরিচয় দেন।

চন্দ্রচূর মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। শ্রী ১০৮ স্বামী দ্বারিকা নাথ তপস্বী সাহেবাবার বীরভূম জেলার কলেশ্বর অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত "চন্দ্রচূর মাহাত্ম্য" নামক প্রাচীন গ্রন্থে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "কপিলেশ্বর কলেশ্বর" তত্ত্বে উল্লেখ আছে।

এখানে পূর্ব্ব সূচনা কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। এই রাজা রামজীবন বাবার সেবাইৎ হইয়া বহুদিন বাবার সেবাপূজো চালান্। তিনিই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রচুর দেবত্র দান করেন। ইনি রাজা রামজীবন রায়, রাজধানী ঢেকা নগর হইতে তপস্যার ইচ্ছায় কলেশ্বরে আসেন। এখানে তিনি দৈববাণী হইতে নির্দ্দেশ পান, "তুমি কপিলেশ্বরে যাও সেখানে গঙ্গাগর্ভে ৫০ হাত নীচে এক শিবলিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গ কলেশ্বরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপস্যা করিতে থাক" তৎক্ষণাৎ তিনি ঢেকায় গিয়া তাঁহার ত্রিকালজ্ঞ পুরোহিত মৃত্যুঞ্জয় মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি রাজা রামজীবনকে জানাইলেন,—দ্বাপর যুগে সত্যসেন নামে এক রাজা ছিলেন অবন্তীনগরে। ইনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি কাশীতে এক শিবলিঙ্গ আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময় অন্য বাণী হইল যে এ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার এখন সময় হয় নাই। কলিতে প্রথম পঞ্চসহস্র বর্ষ মধ্যে রাজা রামজীবন এই শিব প্রতিষ্ঠা করিবে। রাজা সত্যসেন বিফল মনোরথ হইয়া কাশীর গঙ্গাজলে এই লিঙ্গ ফেলিয়া দিলেন। সেই লিঙ্গ স্রোতের বেগে অনাদিলিঙ্গ কপিলেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। এদিকে রাজা রামজীবন মিশ্র মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কপিলেশ্বরের স্থানে যাইবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। যথাসময়ে রাজা গোপনে এই গঙ্গা তীরে আসিয়া এক ব্রাহ্মণের দর্শন পাইলেন। পরে শূন্য বাণীতে তিনি জানিতে পারিলেন ইনিই কপিলমুনি। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে পাতাল। এই স্থান হইতেই নাগলোক। এই ব্রাহ্মণ বেশী কপিলমুনির নির্দ্দেশানুযায়ী বাবা কপিলেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ পুরোহিত রাখিয়া বাবার সেবা পূজোর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (কপিলেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, কলেশ্বর, তত্ত্বে এক কেবল পৃথকভাবে প্রকটিত)।

অতঃপর রাজা রামজীবন বাবা কপিলেশ্বরের অন্তর প্রেরণায় কলেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং গঙ্গাগর্ভস্থ পদ্মনাগ কর্ত্তৃক রক্ষিত লিঙ্গ স্বয়ং এই মন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্! তোমার লীলা কি অসাধারণ, কে বুঝিতে পারে?

: কপিলেশ্বর তীর্থে সাধক তপস্বীবৃন্দ ও অন্যান্য সেবাইত :

এই তীর্থে তারাপীঠের বিখ্যাত সিদ্ধ সাধক বামাক্ষ্যাপা তাঁর গুরুদেবের সহিত আসিয়া তপস্যা করেন। এখানে মহারাজ শিবচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে কৃষ্ণনগর হইতে কান্দি আসিয়া ফিরিবার পথে এখানে কিছুদিন তপস্যা করেন। বামাক্ষ্যাপার মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপাও এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থান বস্ত্র অন্তের আসনভূমি। এই ভূমি আজ পর্য্যন্ত "বস্ত্রাসন" (বর্ত্তমান নাম বাজার সোহু) নামে খ্যাত রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মতে সিং পরগণার জেমো বাঘডাঙ্গার রাজারা বহু বৎসর যাবৎ বাবার সেবা চালাইয়াছেন। তাহারাও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া সেবাপূজোর জন্য ফতেসিং ও পলাশী পরগণার বহু দেবত্র সম্পত্তি দান করিয়াছেন। মেহেরপুরে নিবাসী মল্লিক বংশীয় জমিদারেরা এক সময় বাবার সেবাইৎ ছিলেন। বর্ত্তমানে নদীয়া রাজবংশ বাবার সেবাইৎ।

: শ্রীশ্রীকপিলেশ্বর লীলা :

বাবা কপিলেশ্বরের প্রকট-অপ্রকট অবস্থায় বহু লীলা দৃষ্ট হয়। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা অদ্ভুতভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন। রাজা রামজীবন ও রাজা জয়রাম রায়ের জীবনীতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কৃপালীলার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। পরে কামনার বহরমপুরের বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় কেদারনাথ মাহাতার পিতা জগমোহন মাহাতা

পত্রে কামনা করিয়া কেদারনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগমোহন মাহাতা মহাশয় বহুদিন নিসন্তান ছিলেন। ফলে বর্তমান কাশিলেশ্বর মন্দির তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের গাত্রে প্রস্তর ফলকে তাহার প্রমাণ দিতেছে। যথা— ভক্তিহীন জগমোহন মাহাতা। ১২৪১ সাল।

দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে বহু ব্যক্তি মন্দির দ্বারে হত্যা দিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে; তাহারও প্রমাণ বহু আছে। বামন দাস নামক দাদপুর গ্রাম নিবাসী এক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে। শক্তিপুর নিবাসী রামপদ মণ্ডল শূলে বেদনায় অস্থির হইয়া ভব মণ্ডলের সাহায্যে বাবার মন্দির বারান্দায় হত্যা দিয়া তাঁর অযাচ কৃপা বলে আরোগ্য লাভ করে। বারান্দায় রাম বসিয়া আছে। ভব তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবে, ইতিমধ্যে এক সাধু উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঝোলা হইতে গাঁজার সরঞ্জাম বাহির করিয়া গাঁজা তৈয়ার করিতে বলিলেন। রাম গাঁজা বানাইয়া সাধু বাবার হাতে দিল। সাধু একটান দিয়া রামকে টানিতে দিলেন। রাম টানিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেক পরে রামের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। পরে ভব তাহাকে বাড়ী আনিল। বাড়ী আনিয়া শুনিল যে রামের দৃষ্ট সাধুর মত এক সাধু তাহার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখা দিয়া এক ঔষধ দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে ঐ ঔষধ ব্যবহার করাইতে স্বামী নীরোগ হইল।

প্রবল অনাবৃষ্টি মহামারী ইত্যাদি এই অঞ্চলে দেখা দিলে শ্রীশ্রীকাশিলেশ্বরের বিশেষ পূজা, হোম, যজ্ঞ, গঙ্গাজল সহ দুগ্ধ চিনি দিয়া বাবার স্নান করাইলে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। এখনও অবিশ্বাসের যুগে লোকে কাতরে বাবার প্রার্থনা করিতেছে প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, অমনি কোথা হইতে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল বর্ষণ হইয়া গেল।

হিন্দুর এই প্রাচীন দেবকীর্ত্তি যাহা হিন্দুধর্ম্মের ও কৃষ্টির চরম নিদর্শন তাহা এখন লুপ্ত প্রায়।

—০০—

গান

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি যে আমার প্রভু
　　আমি যে তোমার।
(যেন) এই কথা নিশিদিন
　　জপি বারে বার ॥···
তোমারই রচিত এই বিশ্বভুবন
রবি, শশী, গ্রহ, তারা তোমারি সৃজন
তুমিই দিয়েছ এই তনু মন ধন
　　তুমি ছাড়া কেবা আছে আর ॥···

সব জেনে ভুলে থাকি
　　এ তো বড় দায়
স্মরণে মননে থেকো
　　রেখো রাঙা পায়।
তুমিই দিয়েছ মোরে ত্রিতাপ জ্বালা
পরায়েছ গলে কভু জয়ের মালা—
নিষ্ঠুর মধুর তুমি সত্যানন্দ লীলা—
　　বারে বারে করি নমস্কার ॥···

—১০২—

The Truth of Yajna

Sri Sri Baba Thakur

[13]

What is real and what is unreal can be realised through spiritual discrimination. Such discrimination is followed by detachment and dispassion. Dispassion culminates in detachment. The realisation developed through the above discrimination, relates to the Impersonal aspect of divinity (Nirguna Brahman). The path of discrimination is the path of denial i.e., the path of negation in the nature of 'neti, neti' meaning 'not this, not this'. Through this denial or negation what remains as the last residue can never be denied or negated. This undeniable one is nirguna Brahman. He is unchangeable, immutable, ineffable, immobile, infinite, impersonal, featureless, attributeless. He is nondual, one without second, without beginning and end. He is self-evident, self-existent, self-luminous, self-perfect. He is omnipotent, omnipresent, omniscient.

Personal aspect of divinity is attributefull, featureful and also infinite, immanent or universal. The realisation of this aspect of divinity is developed through the path of all acceptance the path of poesitive approach i.e,, the path of devotion, surrender and love. Positive approach is 'Iti-Vad. According to this approach everything in creation belongs to God. So all functions of life done through body, mind and senses are for the sake of God and on behest of God. To accept all, to treat all, to know all with equal spirit i,e., with a spirit of spiritual sacrifice, is the true worship of God in & through which one gets purified in mind and heart and then has communion with the God.

Impersonal Godhead is realised through 'Neti-Vad' while personal Godhead is realised 'Iti-Vad'. Neti Ved is the path of knowledge and 'Iti-Vad' is the path of devotion and love. And Impersonal-Personal Godhead (Nirguna-Guni) is the Supreme personality of Godhead Absolute designated as Purusottama-Bhagawan. Impersonal Godhead is the source of personal Godhead and the personal Godhead is the highest manifestation of impersonal Godhead and the only source of creation. Impersonal God stands beyond creation and personal God is with creation. Through He is with the creation. He is distinct from and unattached to creation. Creation is the act of prakriti alone. God is inactive, unattached, impartial witness seer of all functions of prakriti. Prakriti alone is the doer, enjoyer and knower of all her functions. Due to adjacency of God prakriti derives creative potentiality. As a result prakriti starts creation. Creation is the expression of gunas of prakriti on the divine existence. Owing to close association God and prakriti appear to be intermingled. Divine virtues project and reflect on prakriti and gunas of prakriti get superimposed on or attributed to God. Such superimposition and attribution result in illusory appearance of creation. This is the view of the Impersonalist. And the personalist views that the creation is not illusory and false but it is the glorious sports of God (Lila). 'Purusottama-Vada' i.e., impersonal personal Godhead is quite distinct from the above two views. It is all divine for all time as it is. In this aspect the difference between real & unreal, impersonal & personal, nondual & dual, creator &

creation, negativity & positivity etc is unsubstantial and hence meaningless. Everything is divine. Whatever exists, whatever is seen and however is felt and experienced, are all the same divine Self. That is to say, the triad of doer, deed, and done, enjoyer, enjoyed and enjoyment ; actor, act and action ; knowner, known and knowledge, seer, seen and seeing etc, is undifferentiated and hence at-one-ment, that is the divine Self Himself. The expressions and manifestations in the divine existence even with their differences in appearance can never be separated or isolated from the divine Self, and hence they can not be other than divine. Supreme person of Godhead Absolute embraces wholly all His expressions and manifestations. From this view point 'all divine for all time as It is' is spontaneous. That is to say, whatever is seen, felt and known, is God, Self or Reality itself. In Reality Divine Self alone exists. He alone is self-luminous and self-existent. Appearance of creation other than Divine Self is unsubstantial. From the standpoint of the Absolute the creation is verily Brahman Himself while from the viewpoint of the Individual Brahman appears to be divisible corporal, featureful and phenomenal creation. It is the same Reality which is realised as infinite Brahman or Atman by true realiser an seer and as universal creation by worldly minded people. The concept of individuality and world-drama results from the play of avidya maya (nescience and ignorance). Avidya-maya is not devoid of knowledge. It is a kind of knowledge other than true knowledge and hence it is false knowledge. Its existence and play both are wholly dependent on the knowledge absolute. Its mysterious play of world-drama is possible only on account of adjacency of the knowledge absolute.

The entire function of prakriti wholly depends on the law of cause & effect and effect & cause which take appearance in a rotational manner. Cause descends in the shape of effect and again effect ascends to cause. Effect is dynamic and in relation to effect cause is static. Since cause and effect both are born of prakriti constituted of ever changeable three gunas they are transitory, changeable and impermanent. So all being under the rule of cause & effect and effect & cause is impermanent. Cause & effect are hence at the two extreme ends of sakti or prakriti. The movement from cause to effect is involution and that from effect to cause is evolution. Both involutionary movement and evolutionary movement have two extreme ends of their own. One is immutable and the other is mutable. Involutionary movement starts from immutable position to mutable position. And evolutionary movement starts from mutable position to immutable one. Of the two ends of involutionary movement the basic one is fundamental central, static and causal and the finishing one is elemental, external, dynamic and actual. And of the two ends of evolutionary movement the elemental one is the second end of the involutionary movement and the finishing one is the basic one of the involutionary movement. At the base of both the movements lies pure consciousness—the Divine Self. So long jiva remains under the rule of cause & effect of prakriti it can not realise its true divine nature. It realises its all divine nature only when it crosses over the cycle of cause & effect of prakriti. In order to overcome the influence of involutionary movement in life jiva must boldly adopt and consciously follow the rule of

evolution. Evolution means journey back to Godhead i.e., back to original source. The characteristic of involutionary movement is the gradual decent of the pure consciousness from the subtlemost state to grossmost state ; and that of evolutionary movement is the gradual ascent of the same consciousness from the grossmost state to the subtlemost state. The law of involutionary movement works through various stages of ups and downs. Similarly the law of evolutionary movement works through various stages of ups and downs. The difference between the two movements lies in the fact that the involutionary one tends towards grossness while the evolutionary one aims towards subtleness. Evolutionary movement in & through spiritual discipline breaks open the coverings resulting from the involutionary movement and finally leads the seeker to the supreme and i.e, realisation of God or Self.

Evolutionary movement in & through spiritual discipline involves all through struggle for existence progressive development and spiritual perfection. This struggle for a spiritual seeker is inevitable in order to get rid of the reactions resulting from the trienguler fight of three gunas in which one tries to acquire supremacy over the other.

In the creation of diversities there is struggle in life — animates & inanimates for the evolutionary development of its both outer nature and inner nature born of gunas. Since the entire creation is the unfoldment of gunas both involutionary and evolutionary movements are functions of gunas and not of consciousness itself. But owing to nescience or ignorance all the movements appear to be those of consciousness to deluded persons. Delusion is the outcome of gunas. It is an attribute or superimposition and hence false and not real. Sense of diversity, activity disparity, individuality, authority quality, quantity, sensuality, materiality is all mere attributes and imposition. They are felt to be real owing wholly to ignorance and for want of self-knowledge. Gunas function through attachment to action and result. Attachment grows from association, association from desire and desire itself is beginningless avidya (nescience). Avidya is one form of ajnana (Ignorance). Consciousness itself is ever pure and free of all gunas and their functions. And gunas and their functions melt away at the dawn of self-knowledge. Individual being attains full freedom or liberation only when it regains its self-knowledge. All ignorance goes away only with the awakening of self-knowledge just as darkness of night and darkness caused by clouds & mists melt away with the rise of the radiating sun. Mind born of triguna prakriti and wholly governed by avidya, regards the play of gunas in the form of universal creation to be real and therefore it remains unaware of the nature of true Self — the ultimate Reality. And when through divine grace it directs itself towards inner divine Self it gets gradually purified, illumined and also enlightened by the true light of Self-consciousness. As a result it fully merges in the Self or rather the Self fully reveals in it. The all pervading divine Self is ever existent. And the playful drama of appearance and disappearance of mind and creation of avidya maya on divine existence, is entirely a magical trick of mysterious maya. In this drama the Divine Self is only a witness seer or supreme subject and maya in multiforms is the seen or object.

(*To be continued*)

With Best Compliments Of :

Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5980

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I. S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial Ceramics Etc. Etc.

Factory :
8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone : 68-1198

Office :
91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

Regd. No. WB/NC-34 ✲ **BHABMUKHEY** ✲ *Phone : 52-7*

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

1 JUL 1985

Manufactured by :

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125

পত্রিকা সচিব—স্বামী পরমানন্দ। সম্পাদক—স্বামী অক্ষয়ানন্দ ও স্বামী নীলানন্দ।
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভদ্রমুদ্রণ থেকে
মহামিলন মঠ, কলিকাতা-৩৬ হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৫২-৫১৭৪)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী [illegible]।
সংখ্যা : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। বার্ষিক মূল্য : বোল টাকা মাত্র।